সুদমুক্ত ও মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা

সুদমুক্ত ও মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা

মো. শাহীমুল ইসলাম বাবুল

উত্তরা

মো. শাহীমুল ইসলাম বাবুল
সুদমুক্ত ও মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক ১৪৩২ ॥ নভেম্বর ২০২৫

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ করা অবৈধ। কোনো ইলেকট্রনিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্যসঞ্চয় করে রাখার পদ্ধতি বা অন্য কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন, সঞ্চয় বা বিতরণ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে কপিরাইট আইন ২০২৩ অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রকাশক
আ. স. ম. শিবলী শিহাব ॥ উত্তরা হাউজ
১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা-১১০০
uttara.house.2021@gmail.com
+৮৮০ ১৭৪৩ ৯২২৪৭৮

প্রচ্ছদশিল্পী
মিলন খান

মুদ্রাকর
স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স

পরিবেশক
আগামী প্রকাশনী

ISBN
978-984-3905-06-2

মূল্য
২৫০.০০ টাকা

উ ৎ স র্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় জান্নাতবাসী আব্বা-আম্মা
মরহুম ফসীর উদ্দীন প্রামাণিক ও
মরহুমা আছিয়া বেগমের
স্মৃতির উদ্দেশ্যে

সূ চি প ত্র

ভূমিকা ॥ ৯
দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণ এবং তার প্রতিকার ॥ ১৩
টানেলের মুখে আলো দেখা যাচ্ছে ॥ ২০
হে আল্লাহ আমাদেরকে ফেৎনামুক্ত জীবন দান করুন ॥ ২৩
সৎ ব্যবসায়ীরা জান্নাতে নবী রাসুলদের সঙ্গে থাকবেন ॥ ২৪
সু-সন্তান একজনই যথেষ্ট ॥ ২৫
সত্যের মৃত্যু নেই ॥ ২৭
সুদমুক্ত সমাজব্যবস্থা কী এবং কেন? ॥ ২৮
প্রতিটা বিচারে ইনসাফ থাকা বাঞ্চনীয় ॥ ৩২
ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে ॥ ৩৩
সমাজের সর্বস্তরে সামাজিক ব্যবসাকে ছড়িয়ে দিতে হবে ॥ ৩৬
মুসলমানেরা কীভাবে সহস্র বছর ধরে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে আবার
কি কারণে তাঁরা তাঁদের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে? ॥ ৩৮
প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর সেই ভবিষ্যৎ বাণীই বারবার
সত্য প্রমাণিত হচ্ছে ॥ ৪৫
অর্থই অনর্থের মূল ॥ ৪৮
চাকুরি করার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে চাকুরি দেয়ার
মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে ॥ ৫১
আমাদের একজন মাহাথীর মোহাম্মদ/খোমেনীর মতো নেতা দরকার ॥ ৫২
আমাদের দেশের গণতন্ত্র ও সমসাময়িক অবস্থা ॥ ৫৫
রাজতন্ত্র বেশীরভাগ সময়ই দুর্বল নেতা উপহার দিয়ে থাকে ॥ ৫৮

বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ আর জীবনের সঙ্গে
সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু ॥ ৬১
ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ॥ ৬৩
শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে ॥ ৬৬
আমাদের চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন করতে হবে ॥ ৬৯
মসজিদকে শুধুমাত্র নামাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমস্ত
সমস্যা সমাধানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে হবে ॥ ৭৪
তিনটি জিনিস মানুষকে ধ্বংস করে ॥ ৭৭
স্বাধীনতার পঞ্চান্ন বছর পরেও কেন বাংলাদেশে গণতন্ত্র মুক্তি পায়নি ॥ ৮০
সব বন্য প্রাণীরা বনে বাস করে কিন্তু কুকুর-বিড়াল বনে বাস
করতে পারে না কেন? ॥ ৮৪
মানুষের ক্ষতি হয় এমন কাজ কখনো করা যাবে না, প্রতিটি কাজ হবে মানুষকে
ভালোবেসে, মানুষের কল্যাণে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ॥ ৮৭

ভূমিকা

১৯৭৭ সনের মার্চ মাসের কথা। তখন আমি চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। গ্রামের আরও দশজন ছেলেমেয়ের মতো আমার জীবনটাও ছিল খুব সাধারণ এবং স্বাভাবিক। গ্রামের জীবনের যে জিনিসটা আমাকে খুব বেশী আকৃষ্ট করে সেটা হলো এখানে কোনো শ্রেণিবৈষম্য নেই। মাঠে যেসব ফসল ফলে গৃহস্থের সন্তানরা সেটার আদলে বাড়ির ধারেকাছে সেটা করার চেষ্টা করে। আমরাও তার ব্যতিক্রম ছিলাম না। নলকূপের পানি যাওয়ার নালার মুখে ৫-৬ ফুট জায়গায় আমি ও আমার চাচাতো ভাই রফিক ইরি ধান লাগিয়েছিলাম। সে সময় তেঘর গ্রামের দুজন ছেলে আমাদের বাড়িতে কাজ করতো। ওরা একদিন বলেছিল আমরা স্কুলে যাবার পর তারা গরু দিয়ে আমাদের ধান খাইয়ে দিবে। কিছুদিন পর দেখা গেল কে বা কাদের গরুতে আমাদের ধান খেয়ে ফেলেছে। আমরা ধরেই নিলাম তারা দু'জনে মিলে কাজটা করেছে। আমি ওদের দু'জনকে মেরেছিলাম। যার ফলে ওরা আমার উপর রাগ করে নিজেদের বাড়িতে চলে গিয়েছিল।

আমাদের বাড়িতে রেওয়াজ ছিল লম্বা বিছানায় কাজের লোকসহ একসঙ্গে সবাই আমরা খেতে বসতাম। রাতে খেতে বসার পর আব্বা জানতে চাইলেন অথবা আম্মা নিজের থেকেই বললেন তাদের অনুপস্থিতির কারণ। আব্বা সবকিছু শুনলেন কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না। আব্বা ছিলেন খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং রাশভারী মানুষ। আমি আমার পক্ষের যুক্তি উপস্থাপনের জন্য সব রকমের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম। যেহেতু আব্বা কিছুই জিজ্ঞাসা করেননি যার ফলে আমার কিছুই বলা হয়নি। কিছু বলতে না পারার কষ্টটাই আমার মধ্যে এক ধরনের অনুশোচনার জন্ম দেয়। যার ফলে আমার মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তন আসে। আমি কেন জানি রাতারাতি শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের বন্ধু হয়ে যাই এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি করার। আমি যখন রাজশাহী কলেজের ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র তখন কলেজের পক্ষ থেকে কোনো নবীনবরণ অনুষ্ঠান করা হতো না। কিন্তু বিভিন্ন ছাত্র-সংগঠনের

পক্ষ থেকে নবীনবরণ অনুষ্ঠান করা হতো। আমি সব ছাত্র-সংগঠনের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে যেতাম এবং তাদের নীতি ও আদর্শের কথা শুনতাম। ছাত্র ইউনিয়নের প্রধান অতিথির বক্তব্য আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল এবং তখনই আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ছাত্র ইউনিয়ন করার। প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের একজন শিক্ষক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগে স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার পর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে যখন আমি কাজ শুরু করলাম তার দু'বছরের মধ্যেই সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্রের অধঃপতন শুরু হলো। অবস্থাটা ছিল এরকম যে আমিও ফকির হলাম আর দেশেও দুর্ভিক্ষ পড়ল। এই সময় একজন কলামিস্ট কলাম লিখেছিলেন, 'হাতি ঘোড়া গেল তল ছুঁচো বলে কত জল' অর্থাৎ আমরা বাংলাদেশে যারা সমাজতন্ত্রের কথা বলি তাদেরকে ছুঁচোর সাথে তুলনা করা হয়েছিল। সেই কলামে পর্যায়ক্রমে ১০-১২টি প্রাণীর ছবি দেয়া হয়েছিল। লাইনের প্রথমেই ছিল হাতী ও ঘোড়ার ছবি এবং শেষ প্রান্তে ছিল ছুঁচোর ছবি। আমি ছিলাম কার্ল-মার্কসের সমাজনীতি ও অর্থনীতির সমর্থক বা কার্ল মার্কস ছিল আমার মডেল বা আর্দশ। আমি বুঝতে পারলাম আমার কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে। পরবর্তীতে এটা নিশ্চিত হলাম যে, কোনো ব্যক্তির মতাদর্শ ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পরে শেষ হয়ে যায়। কোনো ব্যক্তির অথবা কোনো নবী-রাসুলের মৃত্যুর পরে তাঁদের নীতি ও আদর্শ পৃথিবীতে থাকেনি এবং থাকবেও না। এই পৃথিবীতে কিয়ামত পর্যন্ত শুধুমাত্র একজনের মতাদর্শই থাকবে সেটা হলো আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শ। শেষ পর্যন্ত আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি সেটা হলো, আমাদের প্রিয়ো নবী সমাজতন্তের জনক এবং তিনি গণতন্ত্রেরও জনক। মদিনার মুহাজির ও আনসার ভাইদের প্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থাই হলো সর্বকালের সেরা সমাজতন্ত্রের উদাহরণ। এখন থেকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আমাদের প্রিয় রাসুল হযরত মুহম্মদ (সাঃ) আমার নিকট মডেল বা আদর্শ।

আমি গ্রামের মানুষ। গ্রামের মানুষের প্রধান যে দুটো অসুবিধা সেটা হলো-ফসল উঠার আগ মুহূর্তে অর্থের অভাব এবং সুবিচারের অভাব। কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদেরকে জামানত ছাড়া ঋণ দেয় না। বিভিন্ন এনজিওসমূহ জামানত ছাড়া ঋণ দেয়া শুরু করলে কৃষকসমাজ খড়কুটোর মতো সেটাকে আশ্রয় করে বাঁচতে চেয়েছিল। কৃষকরা প্রথমে বুঝতে

পারেনি কি জাল দিয়ে তাদেরকে জড়ানো হচ্ছে। যখন তারা বুঝতে পেরেছে তখন আর তাদের কিছু করার ছিল না। বাপ-দাদার জমি বিক্রয় করে তার মাসুল দিতে হয়েছে। আর বাণিজ্যিক ব্যাংক যে ঋণ দেয়, শুনেছি দেয়ার সময়ই ১০-১৫ ভাগ টাকা তারা কেটে রেখে দেয়। যেটা কাউকে বলাও যাবে না, আর বললে সেই ব্যক্তি ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা হারাবে। আর সুদখোর মহাজনের কথা বলাই বাহুল্য। ফসল উঠার আগ মুহূর্তে প্রায় অর্ধেক দামে কৃষক তার ফসল বিক্রয় করতে বাধ্য হতো সুদখোর মহাজনদের কাছে।

সুদ খাওয়া হারাম যা কিনা মায়ের সাথে যেনা করার মতো গুরুতর অপরাধের শামিল, তারপরও কেন আমরা এই অপরাধটি অবলীলায় করে যাচ্ছি বা এটা যে একটা ভয়ানক পাপ সেটা আমরা কিছু মনেই করছি না। সুদকে হারাম হিসেবে পবিত্র কোরআনে ১১ বার উল্লেখ করা হয়েছে। সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা পশ্চিমা বিশ্ব এমনভাবে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে, যেন সুদী অর্থব্যবস্থা মুসলিম বিশ্বের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। এখান থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন তবে অসম্ভব নয়। সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব শুধুমাত্র ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে।

আমাদের দেশের যেহেতু শতকরা ৯০ ভাগ লোক মুসলমান সুতরাং আমাদের পক্ষেই সম্ভব সুদ-মুক্ত অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা। আমরা যদি ৫০/১০০ গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করতে পারি এবং সফলতা পাই তাহলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা পাব ইনশাআল্লাহ। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ করা কারও একার পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। তবে এ বিষয়ে আমি খুব আশাবাদী এবং আমি টানেলের মুখে আলো দেখতে পাচ্ছি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ছবি মাঝেমধ্যে ভাইরাল হতে দেখি সেটা হলো ১৯৬৯ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি মেয়ের ছবি এবং ২০১৯ সনের একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি মেয়ের ছবির পোশাক-পরিচ্ছদে তুলনামূলক পরিবর্তন। অর্থাৎ আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কোনো মেয়েকে আমি বোরখা পরতে দেখিনি কিন্তু বর্তমানে বেশীরভাগ মেয়েরা বোরখা পরে। এটি একটি পজেটিভ পরিবর্তন বা সামাজিক বিপ্লব বলা যেতে পারে। মানুষ জেগেছে, মানুষের এই জাগরণকে সৎ নেতৃত্বের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর দায়িত্ব কিন্তু আমাদেরই।

ছোটবেলায় দেখতাম গ্রামের একজনের সঙ্গে আর একজনের কোনো বিবাদ হলে সমাজের মানুষ বসে সেটা ইনসাফের ভিত্তিতে মীমাংসা করে দিত। এখনও একই প্রক্রিয়ায় সমাজের মানুষ বসে মীমাংসা করে দেয় ঠিকই তবে এখন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ইনসাফের ভিত্তিতে মীমাংসা হয় না। ঘুষের বিনিময়ে মীমাংসা করা হয়। যার ফলে মানুষ ন্যায়বিচার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। আর যে সমাজে ন্যায়বিচার থাকে না, সে সমাজে মানুষ বাস করতে পারে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বহু জাতিগোষ্ঠীকে শাস্তি প্রদান করেছেন বা ধ্বংস করে দিয়েছেন ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের জন্য। যার বহু উদাহরণ মহা-গ্রন্থ আল কোরআনেও রয়েছে। আমাদের উপরও সে রকম শাস্তি আসতে পারে যদি আমরা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে না পারি। যে ব্যক্তির মধ্যে ইনসাফ আছে, যিনি ইসলামী চিন্তধারার ধারক ও বাহক এবং ঘুষ খান না সে রকম মানুষের মাধ্যমে বিচার কার্য পরিচালিত হলে মানুষ ন্যায়বিচার পাবে। ন্যায়বিচার পাবার ক্ষেত্রে মসজিদের ঈমাম সাহেবের ধর্মীয় জ্ঞানের সহযোগিতা নেয়া আবশ্যক। অর্থাৎ প্রতিটি বিচার ধর্মীয় মানদণ্ডের ভিত্তিতে হওয়া অপরিহার্য।

আমি যখন নবম শ্রেণীতে পড়ি তখন একটি হাদীস পড়েছিলাম সেটা হলো, "ইন্নামাল আমালো বিন্নিয়াত" অর্থাৎ কর্মের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভশীল। আমি কথাটিকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। যে কোনো ধর্মের মানুষ হোক না কেন কেউ যদি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মনেপ্রাণে কোনা কিছু চায় তাহলে আল্লাহ তা কবুল করেন। আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন সেই সাথে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করবেন। আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন, সুদমুক্ত ও মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তা যেন কবুল ও মঞ্জুর হয়।

লেখাটি প্রকাশ করতে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন বিশেষ করে খতিব, সাহেবজাদা, আলহাজ্জ, ক্বারী, মাওলানা মো. ফখরুজ্জামান খান সাহেব, যার প্রেরণায় কাজটি এগিয়ে নেয়া সহজ হয়েছে। আমি যেহেতু ইতোপূর্বে কোনো লেখা প্রকাশ করিনি তাই প্রকাশনার বিষয়ে উত্তরা হাউজের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন আমার বড় ভাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. পি. এম. সফিকুল ইসলাম, তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণ এবং তার প্রতিকার

আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিন্যান্স বিভাগে ভর্তি হয়েছি, তখন থেকেই দেশের অর্থব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি। বর্তমানে প্রচলিত অর্থব্যবস্থাই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য দায়ী। আমরা যদি ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে পারি তাহলে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি পাবে না। তাছাড়া বর্তমানে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার কর সংক্রান্ত প্রায়োগিক জ্ঞানের অভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদনকারী হতে শুরু করে খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত যত বারই হাতবদল হয় ততবারই ভ্যাট চার্জ করা হয়, ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থায় একজন সৎ ব্যবসায়ীর পক্ষে ব্যবসা করা খুব দূরূহ ব্যাপার। সরকার যে পরিমাণ ভ্যাট ও ট্যাক্স নির্ধারণ করে দিয়েছে সেটা দিয়ে কোনো ব্যবসায়ীর পক্ষেই ব্যবসা করা সম্ভব না, তাই তারা রাজস্ব সংগ্রহকারী কর্মকর্তার সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হয়। আর ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কর সংগ্রহকারী কর্মকর্তার প্রয়োজন হবে না। যার ফলে সরকারকে তাদের বেতন দিতে হবে না, অফিস ভাড়া দিতে হবে না, পরিবহন খরচ হবে না। আবার ব্যবসায়ীদেরকে ব্যবসা করার জন্য সরকারের বিভিন্ন অফিসে ঘুষ দিতে হবে না বা জরিমানা দিতে হবে না। খাবারের হোটেল ব্যবসায়ীদের ভাষ্যমতে তারা যতই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করেন না কেন, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ঘুষ না দিলে ব্যবসা করা যাবে না। আবার এক হোটেল ব্যবসায়ী পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে মেমো নিয়েছেন পরবর্তীতে তার এক নিকট আত্মীয়ের মাধ্যমে খবর নিয়ে দেখেন তার হোটেল থেকে প্রদত্ত জরিমানার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। কয়েক দিন আগে এক ভুক্তভোগীর বন্ধু বললেন, 'একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট ও আয়কর বকেয়া পড়েছে ৪ কোটি টাকার। যেটি পরিশোধ করা ঐ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। সমস্যাটি সমাধানের জন্য তারা আয়কর কর্মকর্তার সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করার প্রস্তাব দেয়। তখন আয়কর কর্মকর্তা একটি মীমাংসা প্রস্তাব করেন, যদি তাকে

৪০(চল্লিশ) লক্ষ টাকা দেয়া হয় তাহলে বিষয়টি মীমাংসা করা সম্ভব। এখানে আয়কর কর্মকর্তাগণ ঘুষ নিবেন ১০ লক্ষ টাকা আর সরকারী কোষাগারে জমা হবে ৩০ লক্ষ টাকা। বলতে দ্বিধা নেই এইভাবেই আমাদের দেশ চলছে। শুধুমাত্র আয়কর অফিস না, বাংলাদেশের প্রতিটি সেক্টরের একই অবস্থা।' এই সব উটকো খরচ বন্ধ হলেই ব্যবসায়ীরা কম মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করতে পারবে। এতে একদিকে ভোক্তা কম মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করতে পারবে, আবার ব্যবসায়ীদের ঘুষের টাকা/জরিমানার টাকা/চাঁদার টাকা যোগাড় করার জন্য পেরেশানি হতে হবে না। আমাদের দেশের অর্থনীতির প্রধান সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতার কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা হলো।

মুদ্রাস্ফীতি

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আজিজুল হক চৌধুরী স্যার মাস্টার্স ডিগ্রী পড়ার সময় আমাদেরকে ইসলামী ব্যাংকিং পড়াতেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে তিনি আমাদের একটি পরিসংখ্যান দিয়েছিলেন। ১৯০১ সনে যে দ্রব্যের দাম ছিল ১ টাকা, ১৯৯০ সনে সে দ্রব্যের দাম হয়েছে ৬০০ টাকা। অর্থাৎ ৯০ বছরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০০ গুণ। মূল্য-সংযোজন করের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে দ্রব্যমূল্যের হার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার আয়কর কর্মকর্তারে প্রায়োগিক জ্ঞানের অজ্ঞতার কারণে একই দ্রব্যের উপর একাধিকবার ভ্যাট আরোপের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। মূল্য-সংযোজন করের হার ১৫% এর পরিবর্তে শুধুমাত্র ৫% হলে দ্রব্যমূল্য এত বেশী বৃদ্ধি পেত না। ভ্যাটের হার যদি ৫% হয় আর সব মানুষ যদি ভ্যাট প্রদান করে তাহলে ভ্যাট সংগ্রহ হবে বেশী। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যেহেতু ২.৫% হারে যাকাত সংগ্রহের বিধান আছে সেহেতু ৫% হারে ভ্যাট ও ট্যাক্স সংগ্রহ করেই রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব। যদি কেউ ছল-চাতুরীর আশ্রয় না নিয়ে ঈমানী দায়িত্ব মনে করে ভ্যাট ও ট্যাক্স প্রদান করে তাহলে এই ৫% হারে ভ্যাট ও ট্যাক্স সংগ্রহ করাই যথেষ্ট। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, একজন মিষ্টি বিক্রেতার বছরে ১৫% হারে ভ্যাট ধরার ফলে পনের লক্ষ টাকা ভ্যাট প্রদেয় হয়। তখন সে ঐ টাকা ভ্যাট প্রদান না করে ভ্যাট কর্মকর্তার সাথে আলোচনায় বসে কীভাবে এই ভ্যাটের বোঝা হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ঐ ভ্যাট কর্মকর্তা পরামর্শ দেয় দুই লক্ষ টাকা ঘুষ দিলে মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে

জমা দেওয়ার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা যায়। এখানে মিষ্টি বিক্রেতা আট লক্ষ টাকা লাভ করলো এবং সরকারী কোষাগারে পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র জমা হলো। কাজেই ভ্যাটের হার ৫% হওয়াই যুক্তিযুক্ত। শহরে ১৯৯০ সনে মিষ্টির দাম ছিল ৬০-৭০ টাকা কেজি। ১৯৯১ সনে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী ১৫% হারে যখন মিষ্টির উপর ভ্যাট আরোপ করলেন সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টির কেজি হয়ে গেল ৯০-১০০ টাকা কেজি। আমি মনে করি ১৫% এর পরিবর্তে যদি ৫% হারে ভ্যাট আরোপ করা হতো তাহলে দ্রব্যমূল্য তেমন একটা বৃদ্ধি পেত না এবং সরকারের ভ্যাট সংগ্রহের পরিমাণও একই থাকতো বা সবাই ভ্যাট দেয়ার মাধ্যমে সরকারের আয় বৃদ্ধি পেত। ছোটবেলায় দেখতাম গ্রামের সব লোক পাঁচ টাকার বিনিময়ে বেতারের লাইসেন্স করতো। আর এই রাজস্ব সংগ্রহের জন্য সরকারের কোনো রাজস্ব ব্যয় করতে হতো না। বর্তমান ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো প্রকার রাজস্ব ব্যয় ব্যতিত যদি সরকার রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারে তাহলে বিষয়টি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দ্রব্যমূল্যের এই পাগলা ঘোড়া থামানোর একটি ব্যবস্থা আছে। আর সেই ব্যবস্থার নাম হলো ইসলামী অর্থব্যবস্থা। আমরা যদি সামাজিক ব্যবসা চালু করার মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতির বুনিয়াদ স্থাপন করতে পারি তাহলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে না। ভ্যাট ও ট্যাক্স সংগ্রহ করতে সরকারকে কয়েক হাজার লোক নিয়োগ করতে হয়েছে, তাদের বেতন-ভাতাদি, পরিবহন খরচ এবং অফিস ভাড়ার জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়, যা ইসলামী অর্থব্যবস্থায় প্রয়োজন নেই। সরকারের বিভিন্ন সংস্থার ব্যবসা বন্ধের হুমকি, জরিমানার টাকা, ঘুষের টাকা এমনকি সরকারি পেটোয়া বাহিনীর চাঁদাবাজির টাকা দিতে গিয়ে তাদেরকে মুনাফা বেশী করতে হয়। শেষ পর্যন্ত ঐসব টাকার যোগান দিতে হয় সাধারণ ভোক্তাদের, যার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

চাঁদাবাজি

আমাদের অর্থনীতির প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো চাঁদাবাজি। এটি একটি জাতীয় সমস্যা। আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে যাদের কোনো চাকরি নেই, ব্যবসা নেই ও জমিদারী নেই কিন্তু দুহাতে টাকা খরচ করে। এই টাকার উৎস কোথায় কেউ জানে না। যতদিন এইসব টাকার উৎস আমরা উদ্‌ঘাটন করতে না পারব ততদিন অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা

আসবে না। অদৃশ্য আয়ের মাধ্যমে যারা জীবনযাপন করেন, আমাদের সমাজ তাদেরকে রাজনীতিবিদ বলেন। এটা একটা মহান পেশা, মানুষ তাদেরকে সম্মান করে এবং সালাম দিয়ে চলে। তাদের ভয়ে বাঘে-মহিষে একঘাটে পানি খায়, তারা এত বেশী ক্ষমতাধর যে কোর্টের রায়ও তারা প্রভাবান্বিত করার মতো ক্ষমতা রাখে। তাদের কথায় পুলিশ ভদ্রলোকদের কোমরে দড়ি দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যায়, আবার চোর-ডাকাতদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে মঞ্চে বসিয়ে সংবর্ধনা দেয়।

গরুর মাংশের কেজি যখন ছয়শত টাকা ছিল তখন গাবতলী হাটের একজন গরু ব্যবসায়ী বলেছিলেন, 'আমি গরুর মাংশ তিনশত টাকা কেজি খাওয়াতে পারব যদি সোনা মসজিদ থেকে যে গরুর ট্রাক ঢাকায় আসে, সেখানে কোনো ট্রাকে আমাকে যদি চাঁদা দিতে না হয়।' চাঁদাবাজদের ভয়ে দেশের মেধাবীরা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। এই দেশ মেধাবীদের জন্য বধ্যভূমি আর চাঁদাবাজদের জন্য স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। দেশের উন্নয়নে যতদিন আমরা মেধাবীদের সংশ্লিষ্ট করতে না পারব ততদিন উন্নয়ন অসম্ভব। চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে সামাজিক বিপ্লব গড়ে তুলতে হবে।

ঘুষ

ঘুষ একটি জটিল সমস্যা। এটির কোনো নির্ধারিত রেট নেই। ঘুষখোরের চরিত্র হলো 'তারা শক্তের ভক্ত নরমের যম'। অনৈতিক কাজে ঘুষখোরেরা খুব পারদর্শী হয়। ফসলের চেয়ে যেমন আগাছার শক্তি বেশী হয়ে থাকে তেমনি বর্তমান সমাজে সৎ কর্মকর্তার চেয়ে ঘুষখোরদের দাপট বেশী। যে খেতে পারে এবং খাওয়াতে পারে বর্তমান সমাজ তাকেই ধন্য ধন্য করে। অফিসের বাইরে বন্ধুমহলে আত্মীয়-স্বজনদের কাছেও তারা সমানভাবে সমাদৃত। যে টাকা অর্জন করতে কোনো শ্রম লাগে না, বিনিয়োগ লাগে না, আলাদা কোনো সময় দিতে হয় না, বন্যার পানির মতো শুধু আসতেই থাকে, সে টাকা উড়াতে কোনো কষ্ট লাগে না। বন্ধুদের কাছে হয়ে যান তিনি বড় হৃদয়ের অধিকারী, আত্মীয়-স্বজনদের কাছে বনে যান হৃদয়বান সন্তান/ভাই, শ্বশুরবাড়ীতে হয়ে যান সবার প্রিয় জামাই বা দুলাভাই, সমাজের কাছে হয়ে যান দানবীর আর দোকানদারের কাছে হয়ে যান মস্ত বড় স্যার।

ঘুষ এবং দুর্নীতির অভিযোগে পাকিস্তান শাসনামলে তিনশত তিন জন সিএসপি অফিসারকে চাকরি হারাতে হয়েছিল। যার ফলে একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী ঘুষ খাওয়ার আগে চিন্তা করতো সামান্য লোভ করতে গিয়ে শেষে চাকরিটা হারাতে না হয়। দেশ স্বাধীনের পর এসব কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ আবার চাকরি ফিরে পেয়েছেন। এসব ঘুষখোর কর্মকর্তাদের চাকরিতে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ঘুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। ঘুষখোরদের দাপট এমন চরম মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছে যে তাদের বিরুদ্ধে কথা বললে সৎ কর্মকর্তাদের অপমানিত-লাঞ্ছিত হতে হয়। উদাহরণ হিসেবে ছাগল কান্ডের কর কর্মকর্তার কথা বলা যেতে পারে। ছাগল কথা বলতে না পারা এক অবলা প্রাণী। একজন ঘুষখোর কর্মকর্তাকে ধরিয়ে দিয়ে আমাদেরকে শিখিয়েছিলেন যে ঐসব ঘুষখোর কর্মকর্তাদের কাছে আমরা কত অসহায়? চাকরিজীবনে একাধিকবার অভিযোগ উঠার পর বার বার তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। যে সব ঘুষখোর-দুর্নীতিবাজরা একবার একশত কোটি টাকার মালিক হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে আপনি যত অভিযোগ উত্থাপন করেন না কেন সে তার অর্জিত অর্থ খরচ করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হবেন। আর যে কর্মকর্তা অভিযোগ করবেন তার অবস্থা কত ভয়ানক হতে পারে সেটা একবার চিন্তা করে দেখেছেন?

সাধারণত যারা কম টাকার ঘুষ ও দুর্নীতি করে থাকে তারা প্রায় সময় শাস্তির সম্মুখীন হন আবার ঘুষ না খেয়েও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে হয়রানির স্বীকার হয়ে থাকেন। প্রতিটা প্রতিষ্ঠানের পাঁচ জন ঘুষখোর/দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাকে যদি চাকরি হতে অব্যাহতি দেয়া যায় তাহলে ঘুষখোরদের দৌরাত্ব হ্রাস পাবে। আমরা প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে এই সব ঘুষখোরদের প্রতিহত করতে পারব ইনশাআল্লাহ। আসুন আমরা সবাই মিলে ঘুষখোরদের সামাজিকভাবে বর্জন করি।

বিদেশে অর্থ পাচার

যে সব মানুষের মনে বিন্দুমাত্র দেশপ্রেম আছে তারা কখনো বিদেশে অর্থ পাচার করতে পারে না। দেশবিরোধী সেই সব অপশক্তিই অবৈধ্যভাবে অর্জিত অর্থ বিদেশে পাচার করে থাকে। এরা আমাদের দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু— তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। যে লোকের মধ্যে ঈমান নেই তাকে বেঈমান বলে।

দেশকে ভালোবাসা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। যারা বিদেশে অর্থ পাচার করে তারা সবাই বেঈমান। মীর জাফরের বংশধরেরা বংশ পরম্পরায় আমাদের মধ্যে বিরাজ করছে যার কারণে বিদেশে অর্থ পাচার বন্ধ হচ্ছে না। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ওইসব বেঈমানদের আইনের আওতায় এনে বিচার করতে হবে। ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ যদি দেশে থাকতো তাহলে দেশ এত ক্ষতিগ্রস্থ হতো না। বিদেশী প্রেসক্রিপসন অনুযায়ী দেশ চালালে কোনোদিনই এসব সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদের দেশ আমাদেরকেই চালাতে হবে, অর্থ পাচার বন্ধ হলে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রির্জাভ বৃদ্ধি পাবে এবং তারল্য সংকট হবে না কখনো।

প্রতিটা সেক্টরের অপচয় বন্ধ করতে হবে

দেশ স্বাধীনের পূর্বে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারি মালিকানায় ছিল এবং লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে ছিল সে সব প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে জাতীয়করণ করা হলে সেগুলি লুজিং কনসার্ন-এ পরিণত হয়। দেশ স্বাধীনের পূর্বে অর্ধশিক্ষিত লোকজন যে কল-কারখানা চালিয়ে লাভ করলো, পরবর্তীতে শিক্ষিত লোকজন সেটি চালিয়ে লুজিং কনসার্নে পরিণত করলো, কেন এমনটি হলো জানেন? দেশপ্রেমের অভাব বললে ভুল হবে, এখন দেশপ্রেমের দুর্ভিক্ষ চলছে। প্রতিটা সরকারি অফিসে কেনাকাটা মানেই প্রকৃত মূল্যের চেয়ে ৪-৫ গুন বেশী দামে ক্রয়। আর এই ধরনের কার্যক্রমকে আমরা কেউ অন্যায় মনে না করে স্বাভাবিক নিয়ম মনে করি যা আমাদের মূল্যবোধের অবক্ষয় ছাড়া আর কিছুই না। আমাদের চিন্তাভাবনা পরিবর্তনের মাধ্যমে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করতে হবে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারক মহল থেকে দুর্নীতিকে উৎসাহিত করা হয় বলেই কোনো কর্মকর্তার কিছু করার থাকে না। বাজেট ফেরৎ দিলে পরের বছর বাজেট কমিয়ে দেয়া হয়, যার ফলে সরকারি প্রতিটা সেক্টরে আর্থিক বছরের শেষে প্রয়োজন থাক বা না থাক খরচ করার হিড়িক পড়ে যায়। এই রকম মন্দ সংস্কৃতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে না পারলে সরকারি কেনাকাটায় অপচয় বন্ধ হবে না। আমরা নিজের বাসা-বাড়ির জিনিস ক্রয় করার ক্ষেত্রে যেভাবে দরকষাকষি করি, অফিসের জিনিস ক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি একই রকম করতে না পারি তাহলে কোনো দিন আমরা অপচয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারব না।

কোনো কর্মকর্তা যদি সঠিক নিয়মে কেনাকাটা করতে চায় তাহলে তার ভাগ্যে একটি উপাধি জোটে আর সেটি হলো 'ফকিন্নির বাচ্চা'। খলিফা হবার পর আবুবকর ছিদ্দিক মাথায় কাপড়ের গ্যাট নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাথে দেখা। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আপনি যদি পূর্বের ন্যায় কাপড়ের ব্যবসা করেন তাহলে খেলাফত চালানো সম্ভব হবে না। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন তাহলে আমার সংসার চলবে কেমন করে? হযরত ওমর (রাঃ) বললেন রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে আপনার সংসার চালানোর মতো ভাতার ব্যবস্থা করা হবে। যে পরিমাণ টাকা হলে কোনো রকমে সংসার চালানো যাবে ঠিক সেই পরিমাণ টাকা তিনি ভাতা হিসেবে নিতেন। খলিফার স্ত্রী প্রতি বেলা রুটি বানানোর পূর্বে এক মুষ্টি আটা তুলে রাখতেন, এইভাবে ২-৩ কেজি আটা জমা হওয়ার পর সেটি বাজারে বিক্রয় করে মাংশ কিনেছিলেন। খলিফা খাবারের সময় জানতে চাইলেন মাংশ কীভাবে রান্না হলো? তার স্ত্রী জানালেন মুষ্ঠির আটা বিক্রয় করে মাংশ কেনা হয়েছে। বিষয়টি শুনে তিনি খুব ক্ষিপ্ত হলেন, তিনি বললেন তার খেলাফতে বেশীরভাগ মানুষ যেখানে মাংশ খেতে পায় না, সেখানে তিনি নিজে খলিফা হয়ে মাংশ খেলে তিনি আল্লাহর কাছে কী জবাব দিবেন। আমরা যারা সরকারি চাকুরি করি তারা যদি প্রতিটি সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে চিন্তা করতাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম হলে আমরা আল্লাহর কাছে কী জবাব দিব তাহলে সরকারী ক্রয়ে অপচয় বন্ধ হয়ে যেত।

তারাই অকাতরে দেশের জন্য জীবন দিতে পারেন যারা নিজের জীবনের চেয়ে দেশকে বেশী ভালোবাসেন। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন জাতি স্বাধীনতার জন্য এত রক্ত দেয়নি যতটা বাঙালি জাতি দিয়েছে। আমাদের অগ্রজরা আমাদের স্বাধীনতার জন্য যে গুরুদায়িত্ব পালন করে গেছেন গুটিকতক চাঁদাবাজ, ঘুষখোর আর দুর্নীতিবাজদের কারণে আমরা সেই স্বাধীনতার ফসল ঘরে তুলতে পারছি না। চোরে নাহি শুনে ধর্মের কাহিনি। আমরা যত ভালো কথা বলি না কেন তারা এক কান দিয়ে শুনবে আর অন্য কান দিয়ে বের করে দিবে। উম্মতে মোহাম্মাদীর কি করা উচিৎ আর কি করা উচিৎ না এই শিক্ষায় যতদিন আমরা শিক্ষিত হতে না পারব ততদিন মুক্তি অসম্ভব। উম্মতে মোহাম্মদীকে সমস্ত মানব জাতির শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে, আর শিক্ষকদের জ্ঞানের গভীরতা কি হওয়া উচিৎ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

টানেলের মুখে আলো দেখা যাচ্ছে

ধর্ম সংক্রান্ত জ্ঞান আমার কম আবার যতটুকু জানি সেটা আবার মৌলভী-মৌলানাদের নিকট থেকে শোনা। কোন হাদীসের কত নম্বর অধ্যায়ে আছে সেটা হয়ত আমি সঠিকভাবে বলতে পারব না। আমার জানামতে ১ লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে ২ লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর পৃথিবীতে আগমন করেছেন তাদের সবার উম্মত হবে চল্লিশ কাতার আর আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত হবে আশি কাতার। আর এর থেকে অনুমান করা যায় মুসলমানদের জন্য সব চেয়ে বড় বিজয় আগামীতে অপেক্ষা করছে। এক সময় আপনারা শুনেছেন ব্রিটিশদের সম্রাজ্যে সূর্য ডুবে না। আজকে ব্রিটিশরা আছে ঠিকই কিন্তু তাদের সেই সম্রাজ্য আর নেই। আজকে মার্কিন সম্রাজ্য সারা বিশ্বকে শাসন করছে তাদের সেই সম্রাজ্য যে চিরজীবন টিকবে এ কথা বলা যায় না। একটি সম্রাজ্যের পতন ঘটলে সেই জায়গা শূন্য থাকবে না। আমরা মুসলমানেরা যেন সেই শুন্যস্থান পূরণ করতে পারি সে বিষয়ে আমাদের গবেষণার কলেবর বৃদ্ধি করতে হবে। বিগত একশত বছর মুসলমানেরা নেতৃত্ব হারিয়ে অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। নেতৃত্ব ফিরে পেতে হলে ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়নসহ আধুনিক প্রযুক্তির বিষয়ে গবেষণার কলেবর বৃদ্ধি করতে হবে। যিশুখ্রিষ্টের জন্মের দুইহাজার বছর পরও আজকে সারা বিশ্বে খ্রিষ্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি। সারা বিশ্বে তাদের সংখ্যা এখনও ২৪০ কোটি। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা ২০০ কোটি। এখানে একটি ভালো খবর হলো ২০৫০ সনের মধ্যে পৃথিবীতে খৃষ্টান আর মুসলমানদের সংখ্যা সমান সমান হয়ে যাবে। বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমানরাই হলো দ্রুত বর্ধনশীল জাতি। *দৈনিক কালের কণ্ঠের* ইসলামী জীবনের পাতায় একটি পরিসংখ্যান দেখেছিলাম প্রতিদিন সারা বিশ্বে ৮,৫০০ মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। সুতরাং আমাদের সংখ্যা ৮০ কাতার হতে হলে মুসলমানদের জন্য বড় বিজয় অপেক্ষা করছে। ইনশাআল্লাহ ইসলামী অর্থনীতি আগামী দিনের বিশ্বকে নেতৃত্ব দিবে। সামাজিক ব্যবসা প্রচলনের মাধ্যমে আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারব ইনশাআল্লাহ। পকেটে পয়সা না থাকলে কেউ তার

মাতব্বরী মানতে চায় না। আজকে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ সকল প্রকার আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ইন্টারেস্ট এর ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে মুসলমানদের কোনো কর্তৃত্ব নেই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর উসমানিয়া সম্রাজ্যের পতনের মাধ্যমে মুসলমানেরা বিশ্ব নেতৃত্ব হতে ছিটকে পড়ে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় মুসলমানেরা কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। ইন্টারেস্ট বেইসড অর্থ-ব্যবস্থার কারণে মুদ্রাস্ফিতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুদমুক্ত ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে একদিন মুসলমানেরা সারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিবে এটাই আমাদের সকলের প্রত্যাশা। আজকে বিশ্বের ২০০ কোটি মুসলমানেরা ভোক্তার বাজারে পরিণত হয়েছে। আমাদের ভোক্তার বাজারে পরিণত না হয়ে উৎপাদকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ১৯৯০ সনের এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে আমিও ছিলাম একজন সহযোদ্ধা। প্রফেসর ইয়াজ উদ্দিন স্যার ছিলেন তখন শিক্ষক সমিতির সভাপতি। ইয়াজ উদ্দিন স্যারের নেতৃত্বে একটি মিছিল টিএসসি থেকে শুরু করে প্রেস ক্লাবের দিকে যাচ্ছিল কোনোপ্রকার পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই। কোনোপ্রকার পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই সে সময় সহস্রাধিক ছাত্র স্যারদের মিছিলের সাথে যোগ দিয়েছিল। মিছিলে স্লোগান দেয়া হচ্ছিল, "রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়", "দিয়েছি তো রক্ত আরও দিব রক্ত" ইত্যাদি ইত্যাদি। মিছিলটি যখন শিক্ষা ভবনের সামনে পৌঁছেছিল তখন পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ছুঁড়ে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম আমার সামনে পিছনে ডানে বামে কেউ নাই, আমি শুধু একা। অজ পাড়া-গ্রাম থেকে আসা সেই আমি নিজেকে খুব বোকা মনে হচ্ছিল। সবাই দৌড় দিয়ে পালাতে পারলো আমি কেন পারলাম না? মিছিলের সেই স্লোগানটি আমি মন থেকেই দিয়েছিলাম বলেই অন্যেদের মতো আমি দৌড় দিয়ে পালাতে পারিনি। যারা স্লোগানগুলো শুধু মুখে মুখে দিয়েছে মনের থেকে দেয়নি তাদের পক্ষেই দৌড় দিয়ে পালানো সম্ভব হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এরশাদ বিরোধী ঐ আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাত্র শহীদ হননি। ১৯৯০ সনের ঐ আন্দোলনের সাথে ২০২৪ সালের আন্দোলনের পার্থক্য অনেক। এখানে একজন পুলিশ অফিসারকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'স্যার একটি বুলেটে একটি পড়ে

বাকিরা তো কেউ নড়ে না।' বিএনপি-জামাতের বিগত ১২ বছরের আন্দোলনে কোন ঈমানী জোর ছিল না তাই তাদের আন্দোলন সফলতার মুখ দেখে নাই। ২০২৪ ছাত্রদের আন্দোলনে ঈমানী জোর ছিল বিধায় তারা সফল হয়েছে। আমাদের সময়ের ছাত্রদের চেয়ে বর্তমান সময়ের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অনেক বেশ নীতিনৈতিকতাসম্পন্ন। ছাত্রদের এই ঈমানী জোর বৃদ্ধির কারণে টানেলের মুখে আলো দেখা যাচ্ছে।

আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শ যদি অনুসরণ করতে পারি তাহলে আমাদের পক্ষে আমাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাওয়া সম্ভব। বাংলাদেশের কোনো ইসলামিক দলই প্রিয় নবীর আদর্শ পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারছে না বলেই তারা সফলতা পাচ্ছে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে এক সময় কাফেরেরা প্রিয় নবীর সাথে সমঝোতা করতে এসেছিল। তারা বলেছিল আমরা একদিন আপনার আল্লাহর উপাসনা করব আর আপনি একদিন আমাদের খোদার উপাসনা করবেন তাহলে আমাদের মধ্যে আর কোনো বিবাদ হবে না। আপনিও আমাদের খোদাকে মেনে নিলেন আর আমরাও আপনার আল্লাহকে মেনে নিলাম। সেদিন যদি প্রিয় নবী কাফেরদের সেই প্রস্তাবে রাজী হতেন তাহলে আজকে আমরা কি ইসলাম পেতাম? একটি ইসলামী দলের ঐক্য হতে পারে আর একটি ইসলামী দলের সাথে। কিন্তু একটি ইসলামী দলের ঐক্য কীভাবে হয় আর একটি ব্যক্তি আদর্শের দলের সাথে। অর্থাৎ ইসলামী দলগুলোর যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের মধ্যে ক্ষমতার লোভ আছে বলেই তারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছেন না। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষের মনের খবর জানেন। যদি কোনো ইসলামী দলের নেতা এমপি-মন্ত্রী হওয়ার খায়েশ নিয়ে রাজনীতি করেন তাহলে কোনোদিনই রাসুলের আদর্শ বাস্তবায়িত হবে না। পৃথিবীতে কিয়ামত পর্যন্ত শুধুমাত্র একজনের আদর্শই থাকবে আর সেটা হলো আমাদের প্রিয় নবীর আদর্শ।

হে আল্লাহ আমাদেরকে ফেৎনামুক্ত জীবন দান করুন

আমাদের সমাজে ফেৎনার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আখেরী জামানায় ফেৎনার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এ বিষয়ে প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ভবিষ্যৎ বাণী করে গিয়েছেন। এখান থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? আমাদের সব কিছুতেই সহনশীল হতে হবে। আমাদের এই মতের সাথে অনেকে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। তারা বলবেন যে পরিমাণ আঘাত এসেছে ঠিক সমপরিমাণ প্রত্যার্পণ করার বিধান আমাদের ইসলাম ধর্মে আছে। আজকে মুসলমানেরা দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের শিকার। আমরা যদি আমাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে চাই তাহলে আগামী পঞ্চাশ বছর খুব ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। একজন মুসলমান মসজিদে নামাজের সময় বোমা মেরে শত শত মুসলমানদের খুন করছে কেন? এটার সঙ্গে যে ষড়যন্ত্র আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ঐসব ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের সন্ত্রাসী বা জঙ্গি প্রমাণ করা। সারা বিশ্বের মানুষদের মধ্যে মুসলমান হওয়ার প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটার থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্যই এই ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্র। তারা যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন মুসলমানদের জোয়ার তারা কোনোক্রমেই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। জাপানের বীরেরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হেরে যাবার পর থেকে অদ্যাবধি যেমন নীরব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, আমাদেরকেও আগামী পঞ্চাশ বছর নীরবে কাজ করে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। মসজিদে নামাজের সময় বোমা হামলা হয়। করে কারা? মুসলমানেরা নিজেরাই নিজেদের মসজিদে বোমা হামলা করে। কেন করে বা কার কথায় করে? এখানেই বিদেশী ষড়যন্ত্র জড়িত, তারা টাকার বিনিময়ে কাজটি মুসলমানদের মাধ্যমেই করাচ্ছে। আমরা জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে আখিরাতের চেয়ে দুনিয়াবী কার্যক্রমকে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি। যার ফলে টাকার বিনিময়ে হেন কোনো খারাপ কাজ নেই যা আমরা করছি না। টাকা দিয়ে আমাদের ক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে বলেই তাদের পক্ষে এই রকম ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদের সন্ত্রাসী-জঙ্গি বানানো সম্ভব হচ্ছে। আর এভাবেই বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা প্রমাণ করতে সক্ষম হচ্ছে যে, মুসলমানেরা সন্ত্রাসী জাতি। আমাদের সাবধান হতে হবে এই

কারণে যে, টাকার কাছে আমরা যেন আমাদের ঈমান বিক্রি না করি। ইসলামী দলগুলো একজনের বিরুদ্ধে আর একজন প্রকাশ্য জনসভায় যেন বক্তব্য না রাখি। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় মাত্র দুটি ইসলামী দল ছিল। একদল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করলেও অন্য দল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতা করেছে। আমাদের মধ্যে মত-পার্থক্য থাকতেই পারে তাই বলে মৌলিক বিষয়গুলোতে আমাদের একমত হতে হবে। ইসলামী দলগুলোর ঐক্য শুধুমাত্র ইসলামী দলের সাথেই হতে পারে। শুধুমাত্র ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বা ইহলৌকিক সুবিধার জন্য জোট বা ঐক্য করা যাবে না।

সৎ ব্যবসায়ীরা জান্নাতে নবী রাসুলদের সঙ্গে থাকবেন

দেশ স্বাধীন হয়ে প্রায় পঞ্চান্ন বছর হতে চলল অথচ আমরা স্বনির্ভর জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। আর পারিনি বলেই আমাদের বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রেসক্রিপশন মতো চলতে হয়। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, যারা ভিক্ষা গ্রহণ করে তারা কখনো নেতৃত্ব দিতে পারে না। যারা ভিক্ষা প্রদান করে তারাই সারা বিশ্বে নেতৃত্ব প্রদান করে। আমরা এই স্লোগানকে সামনে রেখে সামাজিক ব্যবসাকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে মহান জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। ইসলামী অর্থনীতি আগামী দিনের বিশ্বকে নেতৃত্ব দিবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যে কোনো একজন অতি মেধাবীর চেয়ে দশ জন সাধারণ মেধাবীদের মেধা অনেক বেশী ফলপ্রসূ হবে এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। চলার পথে আমরা যদি কোনো ভুল করি তাহলে দেশ-বিদেশে যারা ইসলামী চিন্তাবিদ আছেন তারা আমাদের সঠিক পরামর্শ দিবেন আমরা এটুকু আশা করতেই পারি। ব্যক্তিস্বার্থে আমরা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো না, আমাদের প্রতিটা সিদ্ধান্তই হবে রাসুল (সাঃ)-এর নির্দেশনা মোতাবেক এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য। আমাদের কোনো পরিকল্পনা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে বুঝতে হবে সেটি প্রিয় নবীর আদর্শ হতে বিচ্যুত ছিল। চলার পথে আমাদের ভুল হতে পারে, আর ভুল হলেই সেটি ধরে নিয়ে আমরা বসে না থেকে প্রিয় নবীর আদেশ অনুযায়ী সে ভুলের সমাধান করব। আমরাই সেই জাতি যারা আগামী দিনের বিশ্বকে নেতৃত্ব

দিব। হযরত ওমর (রাঃ) একবার কিছু যুবক ছেলেদের নামাজের পরও মসজিদে বসে থাকার কারণে তাদেরকে তিরস্কার করেছিলেন। অর্থাৎ নামাজের পরও আমরা যদি মসজিদে বসে থাকি তাহলে আমরা অভাব অনটনে পড়বো যা কখনো কারো কাম্য নয়। সামাজিক ব্যবসা ও ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হলে আমাদের অনেক কাজ করতে হবে। কিয়ামত পর্যন্ত যেহেতু কোনো নবী-রাসুল আসবেন না, সুতরাং সেই দায়িত্ব আমাদেরকেই পালন করতে হবে। পৃথিবীর বুকে যারা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার কায়েমের জন্য কাজ করবেন রোজ হাশরের দিন তাদের মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে দেয়া হবে। আমরা ২০০ কোটি মুসলমান ভোগকারীর বাজারে পরিণত হয়েছি কিন্তু এখন সময় এসেছে আমাদের উৎপাদনকারী হওয়ার। লিভার ব্রাদার্সসহ বিশ্বের অন্যান্য নামী-দামী ব্রান্ডের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ গবেষণা সেল তৈরী করতে হবে এবং সেইমাফিক ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করতে হবে। আমাদের পণ্যের গুণগত মান যদি একটু কমও হয় তাহলেও সেটাই আমাদের ক্রয় করতে হবে। কারণ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পণ্যের গুণগতমানও বৃদ্ধি পাবে এবং কস্টিংও কমে যাবে।

সু-সন্তান একজনই যথেষ্ট

আমি তখন ৭-৮ বছরের বালক। আমাদের বাড়ির সামনে শত বছরের পুরাতন দুইটি বিশাল তেঁতুল গাছ ছিল। সারা বছরই আমরা ঐ গাছ দুইটির নীচে খেলাধুলা করতাম আর বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা বসে বিশ্রাম নিতেন। এমনই কোনো এক গ্রীষ্মের দুপুরে আব্বা আর আমাদের মসজিদের ঈমাম সেকেন্দার আলী সাহেব বসে গল্প করছিলেন। গ্রামের আরও পাঁচজন বালকের মতো আমিও খেলার ফাঁকে এক সময় আব্বার পাশে এসে বসেছিলাম। এমন সময় ঈমাম সাহেব আব্বাকে জিজ্ঞেস করলেন আমার বিষয়ে। আব্বা বললেন আমার ছোট ছেলে। আমাদের সমাজে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে বাবাজি বলে সম্বোধন করা হতো। যেমন ঈমাম সাহেব আব্বাকে বাবাজি বলে সম্বোধন করতেন ঠিক অনুরূপভাবে আব্বাও ঈমাম সাহেবকে বাবাজি বলে সম্বোধন করতেন। ঈমাম সাহেব আব্বাকে জিজ্ঞেস করলেন বাবাজি আপনার ছেলে মোট কয়জন? আব্বা বললেন আমার ছেলে তিন জন। এবার ঈমাম সাহেব আব্বাকে বললেন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনাকে আরও তিন জন ছেলে দেন। আব্বা বললেন কেন বাবাজি আপনি এমন দোয়া কেন করছেন? ঈমাম সাহেব বললেন আপনি বাবার একমাত্র সন্তান হওয়ার কারণে শত্রুপক্ষের সাথে আপনার ঠিক মত বোঝা-পড়া হয় না। আপনার ছয় ছেলে হলে শত্রুর সাথে ভালো বোঝা-পড়া হবে। আব্বা বললেন, 'ছেলের মতো ছেলে হলে একজন ছেলেই যথেষ্ট, ছয় জন ছেলের প্রয়োজন হয় না। একজন সু-সন্তান একটি সমাজ পরিবর্তন করতে পারে, একটি দেশ পরিবর্তন করতে পারে এবং এক হাজার লাঠিয়াল বাহিনীর মোকাবিলা করতে পারে।'

নীতিনৈতিকতার অবক্ষয় আমাদের সমাজ তথা বাংলাদেশে এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে এখন সত্যিকারভাবেই একজন সু-সন্তান খুবই প্রয়োজন। যে কিনা আমাদের দেশটাকে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের অতল গহব্বর থেকে টেনে তুলবে। কাজটা শুরু করা প্রয়োজন? কিন্তু কীভাবে কোথা থেকে শুরু করতে হবে সেটা আমাদের জানা নেই। প্রয়োজন কোনো নিয়ম মানে না, তাই দেশের এই দুঃসময়ে প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের উচিৎ সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিয়োজিত করা। আমরা যদি শুরু করতে পারি তাহলে পথই আমাদেরকে পথ দেখাবে। যুগ্মসচিব সালাম ভাই একদিন একটি গল্প বলেছিলেন। এটি চীন দেশের ঘটনা। চীনের একটি গ্রামের লোকেরা পাহাড়ের বিপরীত দিকে অবস্থানের কারণে সূর্যের আলোর অভাবে ফসল ফলাতে পারত না বা ফসল হলেও ফলন ভালো হতো না। একদিন এক লোক সাহস করে পাহাড় কাটা শুরু করলেন সূর্যের আলো আনার জন্য। গ্রামবাসী প্রথমে মনে করেছিলেন লোকটির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তারা লোকটিকে বুঝানোর চেষ্টা করলো আপনি যা শুরু করেছেন তা কোনো দিনই শেষ করা সম্ভব না। এখানে লোকটির যুক্তি হলো আমি শুরু করলাম আমি যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন এই মাটি কাটার কাজটি চালিয়ে যাবো, সেই সাথে অছিয়ত করে যাব আমার ছেলেকেও একই কাজ করার জন্য। আমার ছেলে আমার নাতিকেও একই অছিয়ত করে যাবে এবং একদিন না একদিন আমরা সূর্যের আলো আনতে সক্ষম হবো। কাজটি শুরু করার ৫-৭ দিন পর লোকটির ছেলে তার সাথে যোগ দিলো। তারপর ৩-৪ জন গ্রামবাসী তাদের সাথে যোগ দিলো। কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত গ্রামবাসী তাদের সাথে যোগ দিলো এবং কয়েক বছরের মধ্যে তারা এই অসাধ্য কাজটি সম্পন্ন

করতে সক্ষম হলো। এই ধরনের কাজ শুরু করলে মানুষ আপনাকে প্রথমে পাগল মনে করতে পারে তবে পৃথিবীতে যত কিছু আবিষ্কার হয়েছে তার বেশীরভাগই সম্ভব হয়েছে ঐসব মানুষের দ্বারা। যাদের চিন্তা-চেতনা এই সমাজের আরও দশ জন মানুষের চেয়ে আলাদা।

সত্যের মৃত্যু নেই

যে কোনো কাজে সফলতা পেতে হলে সততা ও একাগ্রতা যদি থাকে তাহলে সেটি কখনো বিফলে যেতে পারে না। আমরা যদি পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাই সব কাজে ব্যর্থতার কারণ হলো একটিই আর সেটি হলো ঈমানী জোরের অভাব। কোনো সামাজিক কাজ করতে গিয়ে যদি আপনি ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দেন তাহলে সেখানে সফলতার সম্ভবনা ০%। আর প্রিয় রাসূলের আর্দশকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টিলাভের জন্য আপনি যদি মরেও যান তাহলে কাজটি বিফল হয়েছে বলে আমরা মনে করব না। দুনিয়ার বুকে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যে সব মানুষেরা জীবন দিয়েছেন তাদের আত্মত্যাগ কখনো বিফলে যায়নি। সক্রেটিসকে দোষী সাব্যস্ত করে বিষ পানে হত্যা করার যে রায় তখনকার দিনের বিচারকরা দিয়েছিল সেটি ছিল শুধুমাত্র শাসক গোষ্ঠীকে খুশী করার জন্য। তাই মৃত্যুর সময় সক্রেটিস বলেছিল, 'I to die you to live which is better God knows well' পৃথিবীর বুকে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যদি মৃত্যুও হয় তাহলে সে মৃত্যু হবে শ্রেষ্ঠ মৃত্যু। সক্রেটিস জীবন দিয়ে সেটা প্রমাণ করেছিলেন। যে বিচারক সক্রেটিসের বিচার করেছিলেন বা যে শাসকগোষ্ঠী এই ধরনের অন্যায় তার উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন তাদের নাম কেউ জানে না আর জানলেও তাদেরকে সবাই ঘৃণাভরে স্মরণ করে। আর পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন সক্রেটিসকে সবাই শ্রদ্ধাভরে স্বরণ করবে। অনুরূপভাবে আমরা যাকে ঈসা (আঃ) বলি আর খ্রিষ্টানরা যাকে যীশু বলে তাকেও মানুষের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চতুর্থ আকাশে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। খৃষ্টান এবং মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষই বিশ্বাস করেন যে, ঈসা (আঃ) বা যীশু কিয়ামতের আগে আবার পৃথিবীতে আসবেন। তবে তিনি নবী হিসেবে আসবেন না, তিনি আসবেন আমাদের প্রিয় নবীর উম্মত হিসেবে।

খ্রিষ্টানরা যীশুকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ছেলে দাবী করে যে শিরক করে থাকেন, সে বিষয়টি থেকে দ্বিধা-দ্বন্দ দূর করার জন্যই তিনি পৃথিবীতে আবার আগমন করবেন।

ইসলামের যে সব যুদ্ধে সাহাবীরা নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের সেই আত্মত্যাগ কখনও বিফলে যায়নি বা যাবেও না। অনুরুপভাবে ব্রিট্রিশবিরোধী আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সময় যে সব দেশপ্রেমিক শহীদ হয়েছেন তাদের সেই জীবন দান কখনও বিফলে যাবে না। পৃথিবীতে এমন কোনো নবী বা রাসুল পাওয়া যাবে না যারা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন কিন্তু দুনিয়ার মানুষের দ্বারা আক্রান্ত হননি। তারা শুধুমাত্র নবী বা রাসুলদের মুখে তিরষ্কার করেই ক্ষান্ত হননি, অনেক সময় তারা শারিরিকভাবে আক্রমণ করেছেন ও রক্তপাত ঘটিয়েছেন।

সুদমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কি এবং কেন?

সারা বিশ্বের প্রতিটি দেশ ইন্টারেষ্ট বেইসড অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ইন্টারেস্ট বেইসড অর্থনীতির কার্যক্রম যত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে মুদ্রাস্ফিতিও ততবেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৭৫৭ সনে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর থেকেই আমাদের ভাগ্যে যেন শনির দশা কাটছে না। বাঙালি বহু সংগ্রাম করেছে বহু রক্ত দিয়েছে কিন্তু তাদের ভাগ্যের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা বলেছেন, 'বাংলা যেন ধন সম্পদপূর্ণ এক দোযখ।' ইংরেজরা জমিদারী প্রথা চালু করার মাধ্যমে বাঙালিদের শোষণ ও নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বাড়াতে থাকে। তারা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি অবলম্বন করে। সমস্ত উপমহাদেশকে বানিয়ে ফেলেন করদ রাজ্য। আর আমাদের জমিদার শ্রেণি কোনো রকম নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে কৃষকদের প্রতি করের বোঝা বাড়াতে থাকে। পরিস্থিতি এতটা খারাপ ছিল যে, সাধারণ কৃষকদের জমির পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে চাইলেও তারা সেটা নিতে রাজি হতো না। তারা বলতো যে জমি-যিরাত আছে জমিদারকে খাজনা দিয়ে তা টিকিয়ে রাখা দূরূহ ব্যাপার। দীন বন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ নাটকে কৃষকদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে নীল চাষের যে করুণ কাহিনি ফুটে উঠেছে তা থেকে অনুমান করা যায় যে, ইংরেজদের ঐ নীল কুঠিগুলি

ছিল কৃষক নির্যাতনের অভয়ারণ্য। ১৯৫৪ সনে জমিদারী প্রথা রহিতকরণের মাধ্যমে বাংলার কৃষককুল পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয় ঠিকই কিন্তু সঠিক নেতৃত্বের অভাবে এখনো তাদের শনির দশা কাটেনি। কৃষকদের নাম ভাঙিয়ে প্রতিটি সরকার কোটি কোটি টাকা বিদেশ থেকে সাহায্য ও অনুদান এনেছে কিন্তু কৃষকদের ভাগ্যের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। কৃষকদের কৃষি লোন দেয়ার সরকারি নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সরকারি ব্যাংকসমূহ কৃষকদের লোন দেয় ঠিকই কিন্তু দেয়ার সময়ই ১৫-২০% কেটে রেখে অবশিষ্ট টাকা দেয়। যা কিনা মরার উপর খাড়ার ঘায়ের সামিল। তাছাড়া জামানত ছাড়া যেহেতু ব্যাংক লোন দেয় না। যার ফলে বর্গাচাষী বা ভূমিহীনরা এই লোন নিতে পারে না। দেশ স্বাধীনের পর বহু রকমের এনজিও জামানত ছাড়া কৃষকদের লোন দেয়া শুরু করলো কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় হলো সুদের হার এত বেশী যে একবার এই লোনের জালে জড়িয়েছে, সে আর এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। বাংলার কৃষককুলের অবস্থা অনেকটা ষোড়ষী কন্যার মতো, জ্বীনে ছাড়ে তো ওঝাতে ছাড়ে না।

বাংলাদেশে ৮৭,০০০ হাজার গ্রাম আছে। প্রতি গ্রামে যদি এক লক্ষ টাকা দিয়ে যদি সুদমুক্ত লোনের প্রচলন করা যায়। সমাজের সর্বস্তরের হৃদয়বান ব্যক্তি ও রাষ্ট্র যদি আমাদের এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তাহলে সুদমুক্ত ও মসজিদভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। আমরা শুরু করে গেলাম পরবর্তীতে আমার ছেলে-মেয়েরা ও নাতি-পুতিরা অংশগ্রহণ করবে বিধায় আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আমরা সফল হবো ইনশাআল্লাহ। এখন প্রতি গ্রামেই ১০-১৫ জন হাজী সাহেব আছেন বা অবস্থাপন্ন গৃহস্থ আছেন যারা সুদ খায় না। আমাদের এই পরিকল্পনা যদি আলোর মুখ দেখে তাহলে ওইসব হাজী সাহেব বা স্বচ্ছল গৃহস্থরা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন ইনশাআল্লাহ। ফসল উঠার আগ মুহূর্তে ৩-৪ মাসের জন্য যদি কৃষকদের সুদমুক্ত লোন দেয়া যায়, তাহলে তারা ফসল উঠার পরে তা পরিশোধ করবে। ধরি ১০ জন কৃষকের প্রত্যেককে দশ হাজার টাকা করে মোট এক লক্ষ টাকা লোন দেয়া হলো এবং ফসল উঠার পরে তারা সেটি পরিশোধ করলো। গ্রামের নেতৃত্বস্থানীয় ৭/৯/১১/১৩ জন লোকের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে দিতে হবে। এই কমিটির লোকেরা কখনো লোন নিতে পারবে না। এই লোনের মেয়াদ ছয় মাসের বেশী হবে না। উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে

সামনে রেখে রাজশাহী জেলার বাগমারা থানার কামনগর গ্রামে মাসে সাত হাজার লিটার তেল উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সরিষা তৈলের মিল স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত মিলের মুনাফার টাকা শুধুমাত্র সুদমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যই ব্যয় করা হবে। হে আল্লাহ আমাদের এই মহৎ উদ্যোগকে আপনি কবুল ও মঞ্জুর করুন। আমরা যেন সুদমুক্ত ও মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার কৃষককুলের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারি।

মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা সমাজে ইনসাফপূর্ণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এক অনন্য মডেল হিসেবে কাজ করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। মসজিদ শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের সার্বিক কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে হবে। হিযরতের পর প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সা:) মসজিদ-এ নববীতে বসে সমরনীতি, রাজনীতিসহ সব সমস্যা ইনসাফের ভিত্তিতে সমাধান করতেন। যে সব নেতারা ঘুষের বিনিময়ে মানুষের সমস্যা সমাধান করে থাকেন তাদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হবে। যার ইসলামী জ্ঞানের অভাব আছে প্রয়োজনে সে যে কোনো আলেমের সহযোগিতায় সঠিক সমাধানের চেষ্টা করবেন। মসজিদের ঈমাম সাহেব ইনসাফের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা করবেন। প্রত্যেক মানুষকে বিবেক দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিৎ, আর মানুষের বিবেকের চেয়ে বড় বিচারালয় এই পৃথিবীতে নেই। প্রত্যেকটা মানুষের জ্ঞান সীমিত আর এই সীমিত জ্ঞানকে সম্প্রসারিত করার জন্য পড়ালেখা করা প্রয়োজন। প্রতিটা সমাধান হতে হবে ইনসাফের আলোকে এবং হাদীস কোরআনের ভিত্তিতে। আমার নিজের জন্য যা চাইতাম বা যা করতাম ঠিক একই জিনিস অন্যের জন্য চাওয়ার নামই হলো বিবেক। অর্থাৎ বিবেক দ্বারা পরিচালিত বিচারকার্য সব সময় সঠিক হয়।

একজন বিবেকবান লোক যা করেন আর একজন বিবেকবান লোক যা না করেন তার নামই হলো আইন। মসজিদ শুধুমাত্র একটি উপাসনালয়ই নয়, বরং এটি একটি মিলন মেলা, যেখানে মানুষ একত্রিত হয়ে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে। জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা ছাড়াও পারিপার্শ্বিক সহযোগিতা সহমর্মিতা বৃদ্ধি করা, শিক্ষা ও সেবামূলোক কার্যক্রম, সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বন্ধন তৈরিতে মসজিদ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মসজিদে নববী ছিল একটি শিক্ষাকেন্দ্র, রাজনৈতিক আলোচনার মজলিস, যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণের

অঙ্গন, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্র এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে একতাবদ্ধ করার এক মহৎ কেন্দ্রবিন্দু। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌র জন্য; সুতরাং সেখানে আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে আহ্বান করো না।' (সূরা আল জিন, আয়াত: ১৮) মসজিদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র এই সরাসরি সম্পর্কের ঘোষণা আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে নৈতিকতা, নেতৃত্ব, শিক্ষা অর্থনীতিসহ সমাজের প্রতিটি দিকই এই প্রতিষ্ঠানের আলোয় গঠিত হওয়া উচিৎ। যে সমাজ মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে, সেখানে মানুষের মাঝে আল্লাহভীতি জাগ্রত থাকে। যেখানে ধনী-গরীব, নেতা-জনতা, ব্যবসায়ী-শ্রমিক এক কাতারে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করে।

মসজিদের ঈমাম শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িয়ে তার দায়িত্ব শেষ করলে হবে না, বরং তিনি হয়ে উঠতে পারেন সমাজের নৈতিক দিকনির্দেশক, শিক্ষাদাতা ও মানবিক নেতৃত্বের প্রতীক। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আজ আমরা দেখি মসজিদ থেকে সমাজ বিচ্ছিন্ন, আর সমাজ থেকে মসজিদ বিচ্ছিন্ন। মসজিদে শুধু ইবাদত হয় আর সমাজ চলে পাশ্চাত্য চিন্তাধারায়। এই বিচ্ছিন্নতা এক ধরনের আস্থাহীনতা তৈরী করেছে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার প্রাণশক্তি হলো মসজিদ। মসজিদকে সমাজব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে সেখান থেকে ঈমানদার নাগরিক জন্ম নিবে, ন্যায়পরায়ণ শাসক সৃষ্টি হবে, আদর্শ পরিবার গড়ে উঠবে। আর রাষ্ট্রের ভীত রচিত হবে খোদাভীতি ও ইনসাফের ভিত্তিতে। যে দেশে মসজিদ জীবন্ত থাকে, সে দেশের মানুষও জীবন্ত থাকে ঈমান ও হেদায়েতের আলোয়। আজকের মুসলিম বিশ্ব যেভাবে দ্বিধাবিভক্ত, বিপর্যস্ত, নেতৃত্বশূন্য ও দিশেহারা তার থেকে উত্তরণের পথ একটাই, সেটা হলো মসজিদকেন্দ্রিক পুনর্জাগরণ। আসুন আমরা সবাই মিলে মসজিদকে শুধু ইবাদতের স্থান না ভেবে একে ইসলামী চিন্তা, কর্ম, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিণত করি এবং মসজিদ হোক সমাজের আলো।

প্রতিটা বিচারে ইনসাফ থাকা বাঞ্চনীয়

১৯৭৪ সনের কথা। আমাদের গ্রামের লাইবতুল্ল্যা নানার পিঁয়াজ চুরি হয়েছিল। নানার দোস্ত হওয়ার কারণে লাইবতুল্ল্যা সাহেবকে আমরা নানা ডাকতাম। চুয়াত্তর সনের অভাবের কথা আপনাদের কারও অজানা নয়। হামিদ নামের এক লোক যাকে আমরা হামেদ ভাই বলে ডাকতাম। যে কিনা আমাদের লালু প্রামাণিকের মেয়ে ফুল বানুকে বিয়ে করে ঘর জামাই ছিল। আর ঘর জামাই থাকলে যে কোনো মানুষেরই স্বাভাবিক বুদ্ধি-জ্ঞান কিছুটা লোপ পায়। তারই ধারাবহিকতায় হামেদ ভাই লাইবতুল্ল্যা নানার পিঁয়াজ চুরি করে। প্রথমে সিদ্ধান্ত হলো গ্রামের প্রতিটা বাড়ি তল্লাশি করা। তল্লাসির এক পর্যায়ে হামেদের বাড়ির খড়ের পালা হতে চুরি হওয়া পিঁয়াজ উদ্ধার করা হয়। যেহতু হামেদের বাড়ির খড়ের পালায় পিয়াঁজগুলো পাওয়া গিয়াছে সুতরাং এখানে অভিযোগ অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই বিধায় সে চুরির বিষয়টা সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছিল। কোনো অপরাধী তার অপরাধ স্বীকার করার পর তাকে নির্দয়ভাবে পেটানো কতটা যুক্তিসংগত সেটা আপনারাই ভালো বুঝেন। বিচার দৃষ্টান্তমূলক না হলে ভবিষ্যতে চুরির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে সে কারণেই তাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়েছিল। ধরে নিলাম এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল কিন্তু বে-ইনসাফী যে কাজটি তার সঙ্গে করা হয়েছিল, সেটা হলো সমস্ত গ্রামের মানুষকে একবেলা খাওয়াতে যে খরচ হয় সেই টাকাটা তার থেকে জরিমানা হিসেবে আদায় করা হয়েছিল। অতঃপর উক্ত জরিমানার টাকা দিয়ে সমস্ত গ্রামের লোকের একবেলা ভুরি ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। যেহেতু অভাবের কারণে সে চুরি করেছে সেহেতু এই টাকা দিবার সামর্থ্য তার নেই। জমি বিক্রয় করেই তাকে ঐ জরিমানার টাকা সংগ্রহ করতে হবে সে জন্যই তাকে জরিমানা করা হয়েছিল। আর বিচারক পানির দামে তার ঐ জমিটি কিনে নিয়েছিল। এখানেই শেষ নয়, এই যে শুরু, বারো বিঘা জমির মালিক লালু প্রামানিক নামের এক গৃহস্থ ১৫-২০ বছরের মধ্যে তার সমস্ত জমি-জিরাত হারিয়ে আমাদের চোখের সামনে সর্বশান্ত হয়ে গেল। ইনসাফবিহীন একটি বিচার একটি পরিবারকে নিঃশেষ করে দিল।

জমি বিক্রয় করা এমন একটি অলক্ষুণে কাজ, যতদিন তার জমি থাকে ততদিন সে বড় বড় বিপদে পড়ে। জমি থাকা অবস্থায় তার বিপদ আর শেষ হয় না। ক্ষমতাসীনরা আমাদের দেশে মিথ্যা মামলা দিয়ে বিরোধী দলকে সব সময় ঘায়েল করে আবার নিজেরা অঘটন ঘটিয়ে বিরোধী দলের উপর দোষ চাপায়। আর বিচারের নামে প্রহসন করা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। যার ফলে বাংলাদেশে আইনের শাসন কায়েম করা সম্ভব হয়নি। আর যারা বিচারকার্য পরিচালনা করেন চাকরি বাঁচানোর জন্য তাদের সব কিছু করতে হয়। জমিদারদের লাঠিয়াল বাহিনী সাধারণ প্রজাদের যেভাবে নির্যাতন করতো আজকে বাংলাদেশের পুলিশ একই কায়দায় রাজনীতিবিদদের নির্যাতন করে। এই সমাজ ব্যবস্থা পাওয়ার জন্য কি লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছে? অত্যাচারীরা কখনো সফল হতে পারে না, একদিন না একদিন তারা আস্তাকুড়ে নিক্ষেপিত হবে ঠিকই, ইতিহাস তাদেরকে ক্ষমা করবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো জালেম কোনোদিন চিরস্থায়ী হতে পারেনি, আমাদের জমিদারেরা তারই স্বাক্ষ্য বহন করছে। আল্লাহর আইন আর সৎ লোকের শাসন যতদিন কায়েম না হবে ততদিন বিচারের নামে অবিচার চলতেই থাকবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআনে উল্লেখ করেছেন, তিনি বহু জাতিকে ও শাসকগোষ্ঠীকে নির্মূল করেছেন অন্যায়-অবিচার করার কারণে। একটি আইন এবং একটি শাসন ব্যবস্থাই কিয়ামত পর্যন্ত বহাল তবিয়্যাতে থাকবে আর সেটা হলো ইসলামী আইন আর ইসলামী শাসন ব্যবস্থা। আর ইসলামের নামেও যারা নাফরনামি করবে তারাও আস্তাকুড়ে নিক্ষেপিত হবে।

ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে

দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। অর্থাৎ যে লোকের মধ্যে দেশপ্রেম নেই তার মধ্যে ঈমান নেই। দেশের স্বার্থে কাজ করা এবং দেশের স্বার্থকে সমুন্নত রাখা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আমাদের প্রত্যেক মানুষের মা হলো দুটি। একটি হলো গর্ভধারিণী মা আর একটি হলো জন্মভূমি মা। আমার গর্ভধারিণী মা যেহেতু মারা গেছেন, যার ফলে তার সেবা করার আর সুযোগ আমার আর নেই। জীবনে যতদিন বেঁচে আছি ততদিন জন্মভূমি মায়ের সেবা করে যাব, আর এই সেবা করার মাধ্যমে আমার আব্বা-

আম্মার আত্মা শান্তি পাবে। ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হয়ে এ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছেন দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য। সে সময় বেশীরভাগ ইসলামী দলই পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় তারা আমাদের দেশে স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। যার ফলে আমরা আজকে ধর্মের কথা বললেই অনেকে মনে করে স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তি। এমনকি দেশ স্বাধীনের পরেও যাদের জন্ম হয়েছে তাদেরকেও স্বাধীনতা-বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করার একটি মিথ্যা প্রয়াস চলছে। সমস্ত দ্বিধাবিভক্তি ভুলে গিয়ে আমরা সবাই একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করব।

একটা পক্ষ ক্ষমতায় থাকলে ভারত থেকে শিল্পী এনে আবার অন্য পক্ষ ক্ষমতায় থাকলে পাকিস্তান থেকে শিল্পী এনে বাজিমাত করে, অথচ নিজের দেশের শিল্পীদের মূল্যায়ন করে না। আমি দেখেছি কিছু মানুষের মধ্যে ভারতপ্রীতি বেশী আবার কিছু মানুষের মধ্যে পাকিস্তান প্রীতি খুব বেশী। যার ফলে বর্তমানে আমাদের দেশে দেশপ্রেমিক লোকের খুব অভাব। এই দুই বলয় থেকে বেরিয়ে এসে দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে দেশীয় উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করতে হবে। আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না যে, ১০০ বছর পূর্বে মুসলমানেরই সারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। এমনকি ১৯২৪ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত অটোমান সম্রাজ্যের (ওসমানিয়া সম্রাজ্যের) পতন হওয়ার পূর্ব পযন্ত মুসলমানদের নেতৃত্ব বহাল ছিল। গত ১০০ বছর ধরে মুসলমানেরা পথহারা পথিকের মতো বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্নভাবে পথ চলছে। একতার অভাবে এবং সঠিক নেতৃত্বের অভাবে আমরা আজ দিশেহারা। আজকে আমরা অভিভাবকহীন এবং নেতৃতশূন্যভাবে কালাতিপাত করছি। ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের প্রদর্শিত দেখানো পথেই আমরা বিচরণ করছি। ভালো-মন্দ বুঝার বোধশক্তিও আমাদের হারিয়ে গিয়েছে। ওআইসিভুক্ত দেশসমূহ আজ শক্তি-সামর্থ্যহীন পুতুলে পরিণত হয়েছে। কোনো মুসলিম দেশের উপর আঘাত আসলে শুধুমাত্র বিবৃতি দিয়েই আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি। বাস্তবিকপক্ষে প্রতিবাদ করার মতো শক্তি ও সামর্থ্য কোনোটিই আজ আমাদের নেই। সমস্ত আরব বসন্তের দেশগুলি একত্রিত হয়েও এক ইসরাইলের সাথে পারে না। কেননা এখন তো আর ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করা যায় না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা আমাদের পাঠ্য বই প্রণয়ন করি না। পরমাণু

গবেষণাকে যতদিন আমরা এগিয়ে নিতে না পারব ততদিন ইসরাইলের সঙ্গে লড়াই করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারব না।

আমরা মুসলমানরা প্রিয় নবীর আর্দশ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছি বলেই প্রতিনিয়ত মার খাচ্ছি এবং অপমানিত-লাঞ্চিত হচ্ছি। আমাদেরকে ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ঈমানী শক্তির জোরেই মুসলমানেরা সারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। এখানে উদাহরণ হিসেবে আমরা হযরত শাহ জালাল (রঃ) যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখ করতে পারি। গৌর গোবিন্দ রাজা সুরমা নদীর সমস্ত নৌকা চলাচল বন্ধ করে দিয়ে হযরত শাহ জালাল (রঃ) এর আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হযরত শাহ জালাল (রঃ) জায়নামাজ বিছিয়ে তিনি তার ৩৬০ জন সঙ্গী-সাথী নিয়ে সুরমা নদী পার হলেন। তিনি প্রথমে তার সঙ্গী-সাথীদের জিজ্ঞাসা করলেন আপনাদের মধ্যে এমন কেহ আছেন যে জীবনে কোনোদিন ফজরের নামাজ কাযা করেন নাই? একজন বললেন তিনি কখনো ফজরের নামাজ কাযা করেন নাই। তখন হযরত শাহ জালাল (রঃ) তাকে আযান দিতে বললেন। উক্ত আযান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌর গোবিন্দের সাত তলা ভবন মাটির সঙ্গে মিশে যায়। এটি ছিল একপ্রকার আধ্যাত্মিক যুদ্ধ।

অনুরূপভাবে খাজা বাবা মঈন উদ্দিন চিশতির সঙ্গে পৃথ্বিরাজের যুদ্ধের কথা আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে পারি। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক মুসিলিম ওলীদের হাজারও উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ইসলামী অর্থনীতি আগামী দিনের বিশ্বকে নেতৃত্ব দিবে এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে এটা শুরু হবে কোন দেশ থেকে সেটা আমরা যদিও নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। তবে হতে পারে সেটা তুরস্ক, মিশর, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মালোয়েশিয়া বা ইন্দোনেশিয়া। অন্ধকার যত গভীর হয়, সূর্যের আলোর আগমন বা ভোরের আলোর অমানিষা ততবেশী সন্নিকটে এসে যায়। এখন যেহেতু অন্ধকার অনেক গভীর হয়েছে এবং সারা বিশ্বের মুসলমান মজলুমে পরিণত হয়েছে, সুতরাং দোয়া কবুলের সময় এসে গিয়েছে। কেননা মজলুমদের দোয়া আল্লাহ্ বেশী কবুল করে থাকেন।

বর্তমানে আমাদের দেশ একটি কঠিন সময় পার করছে। আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে যে চেতনা আছে সেটি যদি একবার জাগিয়ে তোলা যায় ১৯৭১ সনের মতো বা জুলাই বিপ্লবের মতো তাহলে আমাদের পক্ষে যে কোনো অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। ১৯৭১ সনের বিপ্লবীরা বা জুলাই

বিপ্লবীরা একই পথে হেটেছে বলে জাতি খুব বড় রকমের ধাক্কা খেয়েছে। তৃতীয়বারের মতো এই জাতিকে জাগিয়ে তোলা খুব কঠিন কাজ। এখন আর আপনাদের রক্ত দিতে হবে না, হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সততার সাথে এবং ইনসাফের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। হে আল্লাহ আমাদেরকে হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবার তওফিক দিন।

সমাজের সর্বস্তরে সামাজিক ব্যবসাকে ছড়িয়ে দিতে হবে

উৎপাদন ব্যবস্থার সূচনালগ্ন থেকে দুটি পক্ষ বিরাজমান। একটি হলো মালিকপক্ষ অন্যটি হলো শ্রমিকপক্ষ। এই দুই পক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন দূরূহ ব্যাপার। শ্রমিকপক্ষ মনে করে মালিক অনেক লাভ করছে কিন্তু সে তুলনায় তাদেরকে পারিশ্রমিক কম দিচ্ছে। ব্যাংকের লোন শোধ না করার সংস্কৃতি চালু হবার পর থেকে মালিকপক্ষ কিছুটা মানষিক প্রশান্তিতে আছে। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকম ব্যয় নির্বাহের জন্য মালিকপক্ষকে মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে হয়। যে দেশে ঘুষ না দিলে কোনো কাজই হয় না সে দেশে ব্যবসা করা যে কত কঠিন সেটি শুধুমাত্র ভুক্তভোগীই বোঝে। সরকার নির্ধারিত ভ্যাট ও ট্যাক্স-এর হার এত বেশী যে কোনো ব্যবসায়ীর পক্ষে তা প্রদান করে ব্যবসা করা সম্ভব না। তাই সঙ্গত কারণে ব্যবসায়ীদের ঘুষ দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতে হয়। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী। সংসদে যারা আইন তৈরী করেন তারা ঘুষখোরদের পক্ষেই তা করে থাকেন। ব্যবসার সূচনালগ্ন থেকেই ব্যবসায়ের সুনাম একটি সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সম্প্রতি সময়ের বেশীরভাগ ব্যবসায়ী তাড়াতাড়ি অল্প সময়ে ধনী হওয়ার জন্য ব্যস্ত, যা ব্যবসায়ের সঠিক পন্থা না। বৈধ-অবৈধ যে কোনো পথে তারা ধনী হতে চায়। যে কোনো ব্যবসার লক্ষ্য টাকা উর্পাজন না হয়ে সেবা প্রদানই একমাত্র মাধ্যম হওয়া উচিৎ। কেননা সৎ ব্যবসায়ীরাই জান্নাতে নবী রাসুলদের সঙ্গে থাকবে।

ব্যবসার নামে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেয়া কত বড় গর্হিত কাজ তা বুঝানোর ভাষা আমার জানা নাই। উৎপাদনকারীর নিকট হতে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে একটি পণ্যের প্রায় ০৪ বার হাতবদল হয়, যার ফলে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায়। বর্তমান ডিজিটাল যুগে উৎপাদনকারী সরাসরি ভোক্তার নিকট পণ্য পৌঁছাতে পারে বিধায় দ্রব্যমূল্য আর বৃদ্ধি পাবে না।

তাছাড়া বর্তমান যুগে মানুষ খুব ব্যস্ত বা মানুষের খুব সময়ের অভাব তাই অনলাইনে অর্ডার করেই মানুষ কেনাকাটা সারতে চায়। এখানে সামাজিক ব্যবসা খুব গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সামাজিক ব্যবসার কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ উপাদান এখানে উল্লেখ করা হলো:

১. ১০০% এর বেশী মুনাফা বন্টন করা হবে না, যদি কোনো বছর ১০০% বেশী মুনাফা অর্জিত হয় তাহলে তাহ সমাজকল্যাণমূলক কাজে বা রিক্রিয়েশনমূলক কাজে ব্যয় করা হবে। যে বছর মুনাফা বেশী হবে তার পরের বছর আনুপাতিক হারে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য কমিয়ে দিতে হবে। যদি মুনাফা না হয়, তাহলে কিছুই দেয়া যাবে না। আর যদি ক্ষতি হয় তাহলে ক্ষতির অংকও মূলধন অনুপাতে বন্টন করা হবে।

২. লভ্যাংশের একটি অংশ কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। তাহলে তারা নিজেকে ব্যবসার অংশীদার মনে করবে এবং নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করে কাজ করবে। তাতে প্রতিষ্ঠানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। বেতন বৃদ্ধি করে একজন এমপ্লয়ীকে যত খুশী করা যায় সমপরিমাণ লভ্যাংশ প্রদান করে তাকে তার চেয়ে বেশী খুশী করা যায়। লাভ-ক্ষতির পরিমাণ কর্মচারীদের জানিয়ে দিলে ব্যবসায় কোনো ক্ষতি হবে না বরং লাভ হওয়ার সম্ভবনাই বেশী। সৎ ব্যবসায়ীরা কোনো কিছু গোপন করেন না।

৩. কর্মচারী নিয়োগের সময় কে কার আত্মীয় বা প্রতিবেশী সেটি বিবেচনায় না এনে যোগ্যতাকে সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দিতে হবে। যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সততাকে বেশী মূল্যায়ন করতে হবে।

৪. প্রায় সব ব্যবসার মূল লক্ষ্য থাকে মুনাফা সর্বাধিকরণ কিন্তু আমাদের সামাজিক ব্যবসার মূল লক্ষ্য হবে সেবা সর্বাধিকরণ এবং সম্পদ সর্বাধিকরণ। আগের বছর যদি মুনাফা বেশী হয় তাহলে পরের বছর দ্রব্যের দাম কমিয়ে দিতে হবে। সেবা সর্বাধিকরণের এমন উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। শুধুমাত্র ইসলামী অর্থনীতিতেই এটি সম্ভব। সৎ ব্যবসায়ীরা যেহেতু বেহেস্তে নবী রাসুলদের সঙ্গে থাকবেন কাজেই সেবার মান কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে সেটা চিন্তাই করা যায় না। আর সেবার মান বৃদ্ধি করার মাধ্যমেই বিশ্বমানের যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হবে।

৫. প্রতিটি শেয়ার ভ্যালু থাকবে এক লক্ষ টাকা মাত্র। এক নামে একটির বেশী শেয়ার ক্রয় করা যাবে না। একটি পরিবারে যত জন সদস্য

থাকবে সবার নামে একটি করে শেয়ার ক্রয় করা যাবে। প্রতিটা শেয়ারের জন্য একটি করে ভোটাধিকার থাকবে। প্রতি বছর হিসাব-নিকাশ শেষে ভোটের মাধ্যমে পরিচালনা পরিষদ নির্বাচিত হবে। বছর নির্ধারণের ক্ষেত্রে আর্থিক বছর বা ক্যালেন্ডার বছর যে কোনোটিই কার্যকরী হতে পারে।

৬. কোনো দেশ যদি ইসলামী অর্থনীতি শতভাগ বাস্তবায়ন করতে পারে তাহলে সে দেশের দ্রব্যমূল্য কোনোদিনই বৃদ্ধি পাবে না ইনশাআল্লাহ। সরকার গ্রেড ওয়ান কর্মকর্তাদের যে পরিমাণ বেতন-ভাতাদি দিয়ে থাকেন সে দেশে প্রাইভেটেও তার দ্বিগুণের চেয়ে বেশী বেতন হওয়া উচিৎ না। বেতন বৈষম্য বেশী হওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে হতাশা বাড়ে আবার কিছু মানুষ অবৈধ্য উপায়ে টাকা রোজগারের সুযোগ খুঁজে। এই সব ক্ষেত্রে (সরকারি/বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই) বেতন নির্ধারণের বিষয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন।

মুসলমানেরা কীভাবে সহস্র বছর ধরে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে আবার কী কারণে তারা তাদের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে?

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতিতে ছিলেন সমান পারদর্শী। তিনি ছিলেন মদিনা খেলাফতের তথা ইসলামী খেলাফতের পথ-প্রদর্শক। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে আমাদের প্রিয় নবীর শাহাদৎবরণের মাধ্যমে এবং মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয়। ১৯২৪ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত অটোমান সম্রাজ্য বা ওসমানিয়া খেলাফত যতদিন টিকে ছিল ততদিন মুসলমানেরা প্রায় অর্ধ বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছে। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর সময় হতে ওসমানিয়া সম্রাজ্যের শেষ সুলতান ৬ষ্ঠ মেহমুদ পর্যন্ত মোট ১০৩ জন শাসক ১২৯২ বছর ধরে অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছেন। ওসমানিয়া খেলাফত ভেঙে যাবার পর ৫৯টি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় কত সুবিশাল ছিল সেই সাম্রাজ্য। অপরদিকে ১২০৬ হতে ১৮৫৭ সন পর্যন্ত প্রায় ৬৫০ বছর ভারত উপমহাদেশের বিশাল অংশ মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল। উত্তরে ইউরোপের অধিকাংশ, দক্ষিণে আফ্রিকার বৃহদাংশ, পশ্চিমে মরোক্ক ও স্পেন আবার পূর্ব দিকে চীন ও রাশিয়ার কিয়দংশ এই সুবিশাল আয়তন

নিয়ে ওসমানিয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হতে শুরু করে অটোমান সম্রাজের শেষ সুলতান ৬ষ্ঠ মেহমুদ পর্যন্ত মোট ১০৩জন খলিফা/ সুলতান প্রায় ১২৯২ বছর ইসলামী বিশ্ব তথা অর্ধ-পৃথিবী শাসন করেছেন। ইসলামের ০৪(চার) জন মহান খলিফা যে সময় ইসলামী খেলাফত পরিচালনা করেছেন, তাদের সে সময়কালকে খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনকাল হিসেবে পরিচিত। খোলাফায়ে রাশেদিনের সময়কাল হতে ওসমানিয়া সম্রাজ্যের শাসনকাল পর্যন্ত সমস্ত ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে যে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে তার পর্যায়ক্রমিক শাসনকাল নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. হযরত আবুবক্কর (রাঃ)	৬৩২ হতে ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
২. হযরত ওমর (রাঃ)	৬৩৪ হতে ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৩. হযরত ওসমান (রাঃ)	৬৪২ হতে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৪. হযরত আলী (রাঃ)	৬৫৬ হতে ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত

ইসলামী খেলাফতের ৪ জন মহান খলিফা মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর শাহাদৎ বরণের পর ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ পযর্ন্ত খেলাফত রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তাদের সবার খেলাফতের রাজধানী ছিল মদিনা। ইসলামী খেলাফতের মোট সময়কালকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। ইসলামের প্রথম যে চার জন খলিফা খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন সেই শাসনকালকে খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনকাল হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র হযরত আবু বকর (রা:) ছাড়া অন্য তিন জন খলিফা সবাই আততায়ীর হাতে শাহাদৎবরণ করেন। খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনকালের পর দামেস্কের অধিপতি মুয়াবিয়া খেলাফত পরিচালনার দায়িত্ব পান। মুয়াবিয়ার বংশের মোট ১৪ জন খলিফা প্রায় নব্বই বছর ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ হতে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত খেলাফত পরিচালনা করেন। তাদের এই শাসনকালকে খেলাফতের ইতিহাসে উমাইয়া শাসনকাল হিসেবে অভিহিত করা হয়। মুয়াবিয়া খেলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পর খেলাফতের রাজধানী মদিনা হতে দামেস্কে স্থানান্তর করেন। মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর হযরত হাসান (রাঃ) খেলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মুয়াবিয়া হযরত হাসান (রাঃ) খেলাফত পরিচালনার দায়িত্ব না দিয়ে রাজতান্ত্রিক পক্রিয়ায় মৃত্যুর সময় স্বীয় পুত্র এয়াজিদকে খেলাফত পরিচালনার দায়িত্ব দেন। তার পরের ইতিহাস

কারও অজানা নয়? তিনি স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য সকল প্রকার শিষ্টাচার ভঙ্গ করে অসদুপায় অবলম্বন করেন। সাতটি প্রদেশের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গকে তিনি দুইশত দিরহাম করে প্রদান করেন স্বীয় পুত্রকে সমর্থন করার জন্য। অন্যদিকে ঈমাম হাসান-এর মতো মহান ব্যক্তিরা তো খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার জন্য কাউকেই দিরহাম দিবেন না। ইসলামে ঘুষ বাণিজ্য প্রথম চালু করেছিলেন আবু সুফিয়ান পুত্র মুয়াবিয়া। ইসলামের দুশমন আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের সময় সস্ত্রীক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন স্বীয় পরিবারের জীবন বাঁচানোর জন্য। মুয়াবিয়ার বংশধরদের এই শাসনকালকে ইসলামের ইতিহাসে উমাইয়া শাসনকাল হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

৫. মুয়াবিয়া	৬৬১ হতে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৬. এয়াজিদ	৬৮০ হতে ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৭. দ্বিতীয় মুয়াবিয়া	৬৮৩ হতে ৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৮. মারওয়ান	৬৮৪ হতে ৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৯. আব্দুল মালিক	৬৮৫ হতে ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
১০. আল ওয়ালিদ	৭০৫ হতে ৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
১১. সুলাইমান	৭১৫ হতে ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
১২. ওমর ইবনুল আব্দুল আজিজ	৭১৭ হতে ৭২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
১৩. দ্বিতীয় এয়াজিদ	৭২০ হতে ৭২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
১৪. খলিফা হিশাম	৭২৪ হতে ৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
১৫. আল ওয়ালিদ	৭৪৩ হতে ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
১৬. তৃতীয় ইয়াজিদ	৭৪৪ হতে ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
১৭. ইব্রাহীম	৭৪৪ হতে ৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
১৮. দ্বিতীয় মারওয়ান	৭৪৪ হতে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) কোরাইশ বংশের হাসেমী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার দাদা আবু মোত্তালিব গোত্র প্রধান ছিলেন। তাঁর চাচা আবু তালেব এর বংশধরেরা পরবর্তীতে খেলাফত পরিচালনার দায়িত্ব পান তাদের এই শাসনকালকে আব্বাসীয় খেলাফফত হিসেবে অভিহিত করা হয়।

১৯. আবুল আব্বাস	৭৫০ হতে ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
২০. আবু জাফর আল মুনসুর	৭৫৪ হতে ৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত

২১. আল মাহাদী	৭৭৫ হতে ৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
২২. আল হাদী	৭৮৫ হতে ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
২৩. হারুন-অর-রশিদ	৭৮৬ হতে ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
২৪. আল আমিন	৮০৯ হতে ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
২৫. আল-মামুন	৮১৩ হতে ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
২৬. আল মুতাসিম	৮৩৩ হতে ৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
২৭. আল ওয়াসিক	৮৪২ হতে ৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
২৮. আল মুতাওয়াক্কিল	৮৪৭ হতে ৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
২৯. আল মুন্তাসির	৮৬১ হতে ৮৬২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৩০. আল মুস্তাইন	৮৬২ হতে ৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৩১. আল মুতাজ	৮৬৬ হতে ৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৩২. আল মুত্তাদি	৮৬৯ হতে ৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৩৩. আল মুতামিদ	৮৭০ হতে ৮৯২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৩৪. আল মুতাদিদ	৮৯২ হতে ৯০২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৩৫. আল মুকতাফির	৯০২ হতে ৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৩৬. আল মুকতাদির	৯০৮ হতে ৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৩৭. আল কাহির	৯৩২ হতে ৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৩৮. আল রাদি	৯৩৪ হতে ৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৩৯. আল মুত্তাকি	৯৪০ হতে ৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৪০. আল মুসতাকফি	৯৪৪ হতে ৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৪১. আল মুতি	৯৪৬ হতে ৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৪২. আল তা'ই	৯৭৪ হতে ৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৪৩. আল কাদির	৯৯১ হতে ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৪৪. আল কায়িম বিল্লাহ্	১০৩১ হতে ১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৪৫. আল মুকতাদি	১০৭৫ হতে ১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৪৬. আল মুসতাজির	১০৯৪ হতে ১১১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৪৭. আল মুসতারশিদ	১১১৮ হতে ১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৪৮. আল রশিদ	১১৩৫ হতে ১১৩৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৪৯. আল মুকতাফি	১১৩৬ হতে ১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৫০. আল মুসতানজিদ	১১৬০ হতে ১১৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৫১. আল মুসতাদি	১১৭০ হতে ১১৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৫২. আল নাসির	১১৮০ হতে ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত

৫৩. আল জাহির	১২২৫ হতে ১২২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৫৪. আল মুসতানসির	১২২৬ হতে ১২৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৫৫. আল মুসতাসিম বিল্লাহ্	১২৪২ হতে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত

আব্বাসীয় খেলাফত আবার দুই ভাগে বিভক্ত: প্রথম ভাগের রাজধানী ছিল বাগদাদ আর দ্বিতীয় ভাগের রাজধানী ছিল কায়রো। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৩৭ জন সুলতান প্রায় ৫০৮ বছর খেলাফতের নেতৃত্ব দেন এবং যার রাজধানী ছিল বাগদাদ।

৫৬. আবুল কাশেম	১২৫৮ হতে ১২৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৫৭. ১ম আল হাকিম	১২৬২ হতে ১৩০২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৫৮. আল মুসতাকফি বিল্লাহ্	১৩০২ হতে ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৫৯. আল ওয়াসিক	১৩৪০ হতে ১৩৪১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৬০. ২য় আল হাকিম	১৩৪১ হতে ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৬১. আল মুতাদিদ	১৩৫২ হতে ১৩৬২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৬২. আল মুসতাসিম	১৩৬২ হতে ১৩৭৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৬৩. আল মুতাওয়াক্কিল	১৩৭৭ হতে ১৩৮৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৬৪. প্রথম আল মুতাওয়াক্কিল	১৩৬২ হতে ১৩৮৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৬৫. ২য় আল ওয়াসিক	১৩৮৩ হতে ১৩৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৬৬. আল মুতাসিমবিল্লাহ	১৩৮৬ হতে ১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৬৭. আল মুতাওয়াক্কিল	১৩৮৯ হতে ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৬৮. আল মুসতাইন	১৪০৬ হতে ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৬৯. ২য় আল মুতাদিদ	১৪১৪ হতে ১৪৪১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৭০. দিত্বীয় আল মুসতাকফি	১৪৪১ হতে ১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৭১. আল কায়িম বিল্লাহ্	১৪৫১ হতে ১৪৫৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৭২. আল-মুসতানজিদ	১৪৫৫ হতে ১৪৭৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৭৩. দ্বিতীয় আল মুতাওয়াক্কিল	১৪৭৯ হতে ১৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৭৪. আল মুসতামসিক	১৪৯৭ হতে ১৫০৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৭৫. তৃতীয় আল মুতাওয়াক্কিল	১৫০৮ হতে ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত

১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গোলীয় অধিপতি চেঙ্গিস খানের নাতী হালাকু খান বাগদাদ দখল করেন এবং বাগদাদকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেন। বাগদাদ নগরী ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়ার পর মুসলমানেরা তাদের খেলাফতের রাজধানী বাগদাদ হতে কায়রোতে স্থানান্তর করেন। ১২৬১

খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ পযর্ন্ত প্রায় দুইশত ছাপান্ন বছর ২০ জন সুলতান কায়রোতে আব্বাসীয় খেলাফতের নেতৃত্ব দেন বা ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আব্বাসীয় খেলাফত কায়েম ছিল।

৭৬. প্রথম সেলিম	১৫১২ হতে ১৫২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৭৭. ১ম সুলেমান	১৫২০ হতে ১৫৬৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৭৮. ২য় সেলিম	১৫৬৬ হতে ১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৭৯. ৩য় মুরাদ	১৫৭৪ হতে ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৮০. ৩য় মেহমুদ	১৫৯৫ হতে ১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৮১. প্রথম আহমেদ	১৬০৩ হতে ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৮২. প্রথম মোস্তফা	১৬১৭ হতে ১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৮৩. ২য় ওসমান	১৬১৮ হতে ১৬২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৮৪. ৪র্থ মুরাদ	১৬২৩ হতে ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৮৫. ইব্রাহীম	১৬৪০ হতে ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৮৬. ৪র্থ মেহমেদ	১৬৪৮ হতে ১৬৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৮৭. ২য় সুলেমান	১৬৮৭ হতে ১৬৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৮৮. ২য় আহমেদ	১৬৯১ হতে ১৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৮৯. ২য় মোস্তফা	১৬৯৫ হতে ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৯০. ৩য় আহমেদ	১৭০৩ হতে ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৯১. ১ম মাহমুদ	১৭৩০ হতে ১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৯২. ৩য় ওসমান	১৭৫৪ হতে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৯৩. ৩য় মোস্তফা	১৭৫৭ হতে ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৯৪. প্রথম আব্দুল হামিদ	১৭৭৪ হতে ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৯৫. ৩য় সেলিম	১৭৮৯ হতে ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৯৬. ৪র্থ মোস্তফা	১৮০৭ হতে ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৯৭. ২য় মাহমুদ	১৮০৮ হতে ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৯৮. ১ম আব্দুল মজিদ	১৮৩৯ হতে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
৯৯. আব্দুল আজিজ	১৮৬১ হতে ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
১০০. ৫ম মুরাদ	১৮৭৬ হতে ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
১০১. ২য় আব্দুল হামিদ	১৮৭৬ হতে ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
১০২. ৫ম মেহমেদ	১৯০৯ হতে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত
১০৩. ৬ষ্ঠ মেহমেদ	১৯১৮ হতে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত

চেঙ্গিস খানের নাতি হালাকু খান যে বছর বাগদাদ দখল করেন কাকতলীয়ভাবে সে বছরই অটোমান সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠতা ওসমানের জন্ম হয়। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হালাকু খাঁনের মতো কুখ্যাত শাসকের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্যই হয়তো বা অটোমান সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠতা ওসমানকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।

অটোমান সম্রাজ্যের সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ যখন ঋণের ভারে জর্জরিত তখন ইহুদীরা তার সমস্ত রাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়েছিল। অটোমান সম্রাজ্যের লোন পরিশোধের বিনিময়ে তারা ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনুমতি চেয়েছিল। অটোমান সম্রাজ্যের সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ-এর সুদুরপ্রসারী ক্ষতির দিকটা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি ইহুদিদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন। ইহুদিরাও নাছোড়বান্দা তারা সহজেই হাল ছাড়েন না। তারা জানতো টাকার বিনিময়ে মুসলমানদের ক্রয় করা যায় বা যে কোন দেশ-বিরোধী কার্যক্রমে লিপ্ত করানো যায়। অবশেষে ইহুদীরা সেই অস্ত্রই প্রয়োগ করলেন এবং সফলও হলেন। কেননা যেখানে মুসলমান থাকবে সেখানে মীর জাফর থাকবে না বা মুনাফেক থাকবে না তা হতে পারে না।

তারা তুরস্কের ইয়াং জেনারেশনকে বুঝাতে সক্ষম হলেন এই সুলতানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে, যার ফলে আটোমান সম্রাজ্য আজ ঋণের ভারে ডুবতে বসেছে। আমরা তার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি সেটাও নিবেন না। এই সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করতে না পারলে তোমাদের পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব না, তাই তারা ইয়াং তুর্ক নামের একটি সংগঠন দাঁড় করালেন এবং তাদের মাধ্যমে আন্দোলন ছড়িয়ে দিয়ে দেশপ্রেমিক সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদকে ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতাচ্যুত করলেন। দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের বিদায়ের মাধ্যমেই মূলত ওসমানিয়া সম্রাজ্যের স্বাধীন সুলতানদের অবসান ঘটে। এরপরও যে দুই জন সুলতান মসনদে ছিলেন তারা ছিলেন পুতুলের মতো তাদের কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। ওসমানিয়া সম্রাজ্যের পতনের পর বিগত ১০০ বছরের মুসলমানদের ইতিহাস লাঞ্চনা-গঞ্জনা ও ইসরাইলি দখলদার বাহিনী কর্তৃক নির্যাতনের ইতিহাস। মুসলমানেরা আজ নেতৃত্বহীন পথহারা পথিক। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, সমরব্যবস্থা, পর্যাপ্ত গবেষণার অভাব, আধুনিক শিক্ষা-বিমুখতা ও প্রযুক্তির সব শাখা থেকে

বিচ্ছিন্ন থাকা ও কৃষি-বিপ্লব, শিল্প-বিপ্লব, তথ্য-বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে না পারার কারণে মুসলমানেরা আধুনিক বিশ্ব-ব্যবস্থার নেতৃত্ব দান করা তো দূরে থাক সাধারণভাবে সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেছে।

অভাব আবিষ্কারের জননী। আরবদের মধ্যে যখন অভাব ছিল তখন আরবরা সারা বিশ্বে বাণিজ্যের কারণে ছড়িয়ে পড়েছিল। আবার আরব বণিকরাই সারা বিশ্বে একদিকে যেমন বাণিজ্য করেছে অন্যদিকে ইসলামের প্রসার ঘঠিয়েছেন। অনরূপভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বলা হতো ব্রিটিশ সম্রাজ্যে কখনো সূর্য ডুবে না। এই ব্রিটিশরাও বাণিজ্যের কারণে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখন ব্রিটিশ নাগরিকরা পড়ালেখা কম করে, বেকার ভাতা/অবসর ভাতা খায় আর স্টেডিয়ামে বসে ক্রিকেটের টেস্ট খেলা দেখে। যে কোনো জাতির অধঃপতনের প্রধান কারণ হলো অলসতা।

আমরা যদি আল কোরআনের গবেষণা অব্যাহত রাখতে পারি এবং প্রতিটি ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে পারি তাহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলমানেরা তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে। আগামী দিনের বিশ্ব দরবারে মুসলমানেরাই নেতৃত্ব দিবে ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর সেই ভবিষ্যৎ বাণীই বারবার সত্য প্রমাণিত হচ্ছে

রাসুল করিম (সাঃ) ভবিষ্যৎবাণী করেছেন সংখ্যায় বেশী হওয়ার পরও দুইটি কারণে তার উম্মতরা শত্রুদের কাছে পরাজিত হবে। যখন তারা দুনিয়ামুখী হবে অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হবে এবং মৃত্যুকে ভয় পাবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণায় অগ্রগামী থেকেই মুসলমানেরা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। ওহুদের যুদ্ধে বিজয় নিশ্চিত হওয়ার পূর্বেই গনিমতের মালের ভাগ-বণ্টন নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহ করার কারণে মুসলমানেরা সেই যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে নাই। উক্ত যুদ্ধে আমাদের প্রিয় নবীর দাঁত মোবারক শহীদ হয়, এমনকি তিনি শাহাদৎবরণ করেছেন বলে যুদ্ধ ময়দানে গুজব রটিয়ে পড়ে। সুলতান জালাল উদ্দীন আল খাওয়ারিজম শাহের বাহিনীর নিকট চেঙ্গিস খানের বাহিনী যখন বারবার পরাজিত হচ্ছিল তখন আব্বাসীয় যুগের সুলতান আল-নাসির

চেঙ্গিস খানকে পত্র দিয়েছিলেন, পূর্ণশক্তি নিয়ে আক্রমণ করে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য দখল করার জন্য। বাগদাদ সুলতান আল নাসিরের পত্র পাওয়ার পর চেঙ্গিস খান নিজেই লক্ষাধিক সৈন্যের একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। জালাল উদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের বাহিনী যুদ্ধে প্রথম দুই দিন সফলতার পরিচয় দিলেও গনিমতের মাল ভাগাভাগির দ্বন্দ্বের কারণে সৈন্যদের একটি বড় অংশ যুদ্ধস্থল ত্যাগ করে এবং তিনি যুদ্ধে পরাজিত হন।

পরবর্তীতে তিনি চেঙ্গিস খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য দিল্লীর সুলতান ও আব্বাসীয় সম্রাজ্যের সহযোগিতা চেয়েছিলেন কিন্তু তারা জালাল উদ্দীন খাওয়ারিজম শাহকে কোনোপ্রকার সহযোগিতা করেন নাই। এটা ছিল ১২২১ সনের বা তার পরবর্তী সময়ের ঘটনা। অবশেষে চেঙ্গিস খান-এর নাতী হালাকু খাঁন ১২৫৮ সনে বাগদাদ আক্রমণ করে এবং বাগদাদকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেন। ১২ দিনে ২৪ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করাসহ সমস্ত বাগদাদ নগরীকে জ্বালিয়ে দিয়ে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিলেন। পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ ছিল যে আব্বাসীয় সুলতানরা তাদের রাজধানী বাগদাদ হতে কায়রোতে স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আব্বাসীয় সুলতানরা বা দিল্লীর সুলতানরা সেদিন যদি জালাল উদ্দীন খাওয়ারিজম শাহকে সহযোগিতা করতেন তাহলে ১২৫৮ সনে চেঙ্গিস খানের নাতি হালাকু খান বাগদাদকে ধবংসস্তুপে পরিণত করতে পারত না। অন্যের ক্ষতি চাইলে যে নিজের ক্ষতি হয়, বাগদাদ সুলতান আল নাসির কর্তৃক চেঙ্গিস খানকে লিখিত পত্র তারই প্রমাণ।

প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সা:) একদিন পূর্বাকাশে তাকিয়ে থেকে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস নিচ্ছিলেন। মহানবী (সাঃ) স্বাভাবিক হওয়ার পর সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কেন এই রকমভাবে লম্বা লম্বা শ্বাস নিলেন। তিনি বললেন, আমি দেখলাম যে আমার উম্মতরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। প্রথম ভাগ শত্রুদের সাথে প্রাণপন লড়াই করে শহীদ হয়ে গেল, দ্বিতীয় ভাগ শত্রুদের সাথে হাত মিলালো আর তৃতীয় ভাগ আবারও শত্রুদের সাথে প্রাণপন লড়াই করে বিজয়ী হলো। বিজয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী কিন্তু তার পূর্বে আমাদের মধ্যে থেকে মুনাফেকদের খুঁজে বের করে আলাদা করতে হবে। মুনাফেক কথার অর্থ বুঝতে অসুবিধা হলে বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর আলী খাঁ-এর পলাশীর প্রান্তরের যুদ্ধের ময়দানের বিষয়টি স্মরণ করা যেতে পারে। রাসুল (সাঃ) বলেছেন অন্য

ধর্মের লোকেরা তোমাদের উপর এমনভাবে আক্রমণ করবে যেমন হিংস্র প্রাণীরা নিরীহ প্রাণীর উপর যেমনভাবে আক্রমণ করে। তখন সাহাবীরা বলেছিলেন আমরা কি তখন সংখ্যায় এত কম হবো যে বিধর্মীরা আমাদের ছিঁড়ে খাবে। তিনি বললেন, তখন সংখ্যায় তোমরা অনেক অধিক হবে কিন্তু ঈমানের জোর কমে যাবার কারণে তোমরা হবে খড়-কুটার মত হালকা। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ১৯৬৭ সনে ও ১৯৭৩ সনে সমস্ত আরব বসন্তের দেশগুলো একসাথে যুদ্ধ করেও ইসরাইলের সঙ্গে পারেনি।

এখানে প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) হতে শিক্ষনীয় বিষয় হলো মৃত্যুকে ভয় পাওয়া যাবে না এবং মৃত্যুর জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। দুনিয়াবী ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আখিরাতের চেয়ে দুনিয়াকে বেশী প্রাধান্য দেয়া যাবে না। কোনো মুসলমান যেন শত্রুদের সাথে সখ্যতা করে বা হাত মিলিয়ে নিজেদের ক্ষতিসাধন না করে। এই ধরনের কার্যক্রম যারা করে ইসলামের ভাষায় তাদেরকে মুনাফেক বলা হয়। আর মুনাফেকদের স্থান হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। মুনাফেকেরা হলো কাফেরদের চেয়েও নিকৃষ্ট। তারা কাফেরদের সাথে মিশে বলে আমরা তোমাদের সাথেই আছি শুধুমাত্র স্বার্থের কারণে মুসলমানদের সাথে চলি। আবার মুসলমানদের সাথে মিশে তারা একই কথাই বলে। নিজেদের মধ্যে একতা বা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করতে হবে। কে শিয়া কে সুন্নি কে ওহাবী এই সব বর্ণনা দিয়ে নিজেদের মধ্যে আমরা যেন বৈষম্যের পাহাড় গড়ে না তুলি। আমরা যারা প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত তারা যেন নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরী না করি এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেন সহনশীলতার পরিচয় দিই। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের মধ্যে বিভেদ তৈরী করার জন্য একটি চক্র কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। চক্রান্তকারীর সেই টাকা খেয়ে আমরা এক ভাই অন্য ভাইয়ের বুকে যেন গুলি না চালাই। পৃথিবীর দুইশত কোটি মুসলমান যদি আমরা একতাবদ্ধ থাকি তাহলে কেউ আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

অর্থই অনর্থের মূল

ছোট এই ভাব-সম্প্রসারণটি পড়েন নাই এমন মানুষ বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকসমাজ বিভিন্ন ক্লাসের বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নটি করে থাকতেন। পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়ার জন্য আমাদের ছাত্রসমাজ তোতা পাখির মত সুন্দর বাক্যের সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষকসমাজকে রাজী খুশী করিয়ে পরীক্ষার খাতায় আশাতীত নম্বর পেতেন। বাস্তবে প্রকৃত সত্য হলো আমাদের চতুর ছাত্রসমাজ উপর্যুক্ত ভাব-সম্প্রসারণ হতে কোনোপ্রকার শিক্ষা গ্রহণ করেননি। এই ভাব-সম্প্রসারণ হতে যদি তারা শিক্ষা গ্রহণ করতো তাহলে আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি দুর্নীতিতে বার বার চ্যাম্পিয়ন হতো না। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) সবসময় মধ্যবিত্ত জীবনকে পছন্দ করতেন। পৃথিবীর প্রতাপশালী রাজা-বাদশারা কেউই চিরদিন কামিয়াব হয়নি। সুতরাং মধ্যবিত্ত জীবন হলো সবচেয়ে উত্তম জীবন। কয়েক বছর পূর্বে পত্রিকায় দেখেছিলাম মোগল সম্রাটদের বর্তমান প্রজন্মকে কলকাতার এক বস্তিতে পাওয়া গিয়াছে। কাতারের ধনকুবের মাখদুম আল রশদিকে তার ধন-সম্পদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তার ভাষায় খুব সহজ-সরলভাবে বলেছেন, 'আমার পূর্ব-পুরুষরা মরুভূমিতে মেষ চরাতো আবার আমার পরবর্তী জেনারেশন আবারও মরুভূমিতে মেষ চরাবে।'

তাবলীগ জামাতের একাংশের আমির সাদ সাহেবের পূর্ব-পুরুষদের মোগল সম্রাটের প্রতিষ্ঠতা জনাব জহির উদ্দিন মোহাম্মাদ বাবর কয়েক হাজার একর জমির জমিদারী দিয়েছিলেন। তখন থেকে অদ্যাবধি তারা উপমহাদেশের মুসলমানদের আলোক-বর্তিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। তাদের খানদান ধ্বংস হয়নি বরং কয়েক শত বছর ধরে টিকে আছে। এই টিকে থাকা আর না থাকার কারণ কী? কারণ হলো তারা সব সময় রাসুল নির্দেশিত পথে চলেছে। অর্থাৎ আমরা যতদিন রাসুল নির্দেশিত পথে চলতে পারব ততদিন আমাদের খানদান ধ্বংস হবে না। আবার যখনই আমরা রাসুল নির্দেশিত পথ হতে ছিটকে পড়ব তখনই ধ্বংস অনিবার্য। রাসুলের নির্দেশিত পথ হতে বিচ্যুতির কারণে উপমহাদেশের পরাক্রমশালী মোগল সম্রাটের বংশধরদের বস্তিতে পাওয়া

যায় আবার তার প্রদত্ত জমির জমিদারদের খানদান টিকে আছে শুধুমাত্র রাসুল নির্দেশিত পথ অনুসরণ করার কারণে।

Finance-এর (অর্থ-সংস্থানের) ছাত্র হিসেবে একটি জিনিস আমি উপলবদ্ধি করতে পেরেছি সেটা হলো, টাকার নিজের একটি আকর্ষণী ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ টাকা যার যত বেশী আছে তারা তত বেশী চায়। যার ১০০ কোটি আছে তার ৫০০ কোটি চায় আবার যার ৫০০ কোটি আছে সে ১ হাজার কোটি চায়। অর্থাৎ যার যতো বেশী আছে তার তত বেশী চায়। দশ জান্নাতি সাহাবী যারা জীবিত অবস্থায় রাসুল (সাঃ)-এর মুখ থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। এই দশ জন সাহাবীর মধ্যে যিনি সবচেয়ে ধনী তার নাম হলো আবদ আল রহমান ইবনে আওফ। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, তিনি রাসুল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন আবদ আল রহমান ইবনে আওফ তার সম্পদের হিসাব দিতে দিতে এত পেরেশানি হবেন যে, 'তিনি হেঁটে হেঁটে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না, তিনি হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।' জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জন সৌভাগ্যবান সাহাবীদের মধ্যে থেকেও শুধুমাত্র সম্পদের হিসাব দিতে গিয়ে যদি এ রকম পরিস্থিতি হয় তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কি অবস্থা হতে পারে একবার চিন্তা করে দেখেছেন? রাসুল (সাঃ) মৃত্যুর সময় তার ঘরে যে স্বর্ণ ছিল তা তিনি গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে বলেছিলেন যদি তিনি এর হিসাব দিতে না পারেন। মহান রবের হাবিব যদি হিসাব দিতে পারবেন কিনা সেই আশংকা থেকে মৃত্যুর পূর্বে সব স্বর্ণ বিলিয়ে দিয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কি হতে পারে? সুতরাং আমরা সবাই সাবধান হয়ে যাই। শুধুমাত্র সম্পদের পিছনে না ছুটে মানুষের কল্যাণের পিছনে ছুটি।

প্রতিটি মুসলমানের উচিৎ তাদের পরবর্তী জেনারেশন যেন রাসুল (সা:) র্নিদেশিত পথ হতে বিচ্যুৎ না হয় সে বিষয়ে অছিয়ত করে যাওয়া। ন্যাক্কার সন্তান পিতা-মাতার জন্য আশির্বাদ আর পথভ্রষ্ট সন্তান পিতা-মাতার জন্য অভিশাপ। আপনার সন্তানেরা যেন সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে অবৈধ্য পন্থা অবলম্বন না করে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। আবার উপার্জিত অর্থ যেন অবৈধ পথে খরচ না করে সে বিষয়ে নজর দিতে হবে। যেসব কর্মকর্তা অবৈধভাবে অর্থ উর্পাজন করে তারা বেশীরভাগই সেই অর্থ আবার অবৈধ পথেই খরচ করে।

মা বোনদের প্রতি অনুরোধ আপনার সন্তান-স্বামী যেন অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন না করে মেহেরবানী করে সে বিষয়ের প্রতি একটু লক্ষ্য

রাখবেন। একটি কথা মনে রাখবেন পাহাড়ে কিন্তু চিরজীবন থাকা যায় না। আপনি যদি পাহাড়ে উঠেন তাহলে একদিন না একদিন নামতেই হবে। সুতরাং আমাদের পাহাড়ে উঠারও দরকার নেই, আবার নামারও দরকার নেই, তাই আমাদের প্রিয় রাসুল (সাঃ) মধ্যবিত্ত জীবনকে বেশী পছন্দ করতেন। একটু মনে করেন ৮০ বছরের পিছনের কথা সে সময়ের জমিদারদের বর্তমান প্রজন্মরা কেউ ভালো নেই। তাই বলে অর্থ উপার্জনকে আমরা নিরুৎসাহিত করছি না। অর্থ উপার্জনটা যেন বৈধ পথে হয় আবার সেটা যেন আমরা জনগনের কল্যাণে ব্যয় করি। জনগনের কল্যাণে ব্যয়িত অর্থ মানুষের মানুষিক প্রশান্তি বৃদ্ধি করে।

ট্রেন-জার্নি করার সময় এক ভদ্রলোক বলেছিলেন তার একটি দ্বিতল বাড়ী আছে। আবার তাঁর সামর্থ্যও আছে দশ তলা বাড়ী করার কিন্তু সেটা তিনি কখনো করবেন না। এখানে তার যুক্তি হলো তিনি যদি দশ তলা বাড়ী করেন তাহলে তার ছেলে-মেয়েরা অলস হয়ে যাবে। বাড়ী ভাড়া থেকে উপার্জিত অর্থ তার ভবিষ্যৎ জেনারেশনকে অলস করে তুলতে পারে সে কারণে তিনি সামর্থ্য থাকার পরও দশ তলা বাড়ী করবেন না। আমাদের সমাজে এই ধরনের মানসিকতার মানুষ হাজারে একটির বেশী পওয়া যাবে না। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান এই পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণ হওয়ার পর আর মানুষের টাকার পিছনে ছোটা উচিৎ না। মানুষকে যখন টাকার নেশায় পেয়ে যায় তখন সে আর নিজের বউ-বাচ্চাকে সময় না দিয়ে শুধুমাত্র টাকার পিছনে ছুটে। একটা সময় দেখা যায় তার শুধু টাকা থাকে কিন্তু অন্য সব কিছু সে হারিয়ে ফেলে। আর এই কারণেই যুগ যুগ ধরে মনীষীরা বলে গেছেন অর্থই অনর্থের মূল। টাকার প্রয়োজন আছে ঠিকই তবে অতিরিক্ত টাকা সব সময় মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে।

আপনার অর্থ আছে আপনি ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন, যাতে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়ে বিনিয়োগ না করে যদি শুধু বাড়ি বানিয়ে যান তাহলে আপনার ছেলেকে দিয়ে দেশ ও জাতির কোনো উপকার হবে না। সে বাড়িভাড়া খেয়ে জীবন বরবাদ করে দিবে। আবার এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। মেহেরবানী করে বাড়ি বানানোর মতো অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় না করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এই রকম খাতে বিনিয়োগ করে দেশ ও দশের কল্যাণ সাধন করুন।

চাকুরি করার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে চাকুরি দেওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে

দেশে অনেক বড় বড় শিল্পগোষ্ঠী আছে তাদের সন্তানরা চেষ্টা করে তার বাপ-দাদারা যে পরিমাণ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে সে যেন তার চেয়ে আরও বেশী মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। আর এই কারণে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এখনো টিকে আছে। যারা শুধু নিজের লাভের কথা চিন্তা না করে দেশ ও জাতির কথা চিন্তা করে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন তাদের সেই ব্যবসার উপর আল্লাহর রহমত থাকে। একজন ব্যবসায়ী বৈধভাবে যেন ব্যবসা করতে না পারে সেজন্য হাজারও নিয়মের বেড়াজাল দিয়ে যে দেশে আটকানোর চেষ্টা করা হয় সে দেশের নাম আমাদের বাংলাদেশ। যে দেশে ঘুষ না দিয়ে চাঁদা না দিয়ে ব্যবসা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

ইসলামী অর্থনীতি চালু করার মাধ্যমে আমরা ব্যবসায়ীদের নিশ্চয়তা দিতে চাই সুন্দর ব্যবসায়িক পরিবেশের। যেখানে সুদ থাকবে না, ঘুষ থাকবে না এবং চাঁদাবাজি থাকবে না। সুদ, ঘুষ এবং চাঁদাবাজি একটি জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যা কোনো দল বা গোষ্ঠীর পক্ষে এককভাবে সমাধান করা সম্ভব না। ব্রিটিশরা আমাদের চাকর হওয়ার মানসিকতাকে উৎসাহিত করে গিয়েছেন। আমাদের সেই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। চাকুরি করার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসে চাকুরি দেয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে। মনে রাখবেন যিনি চাকুরি করেন তিনি কখনো নেতৃত্বের আসন পায় না। যিনি চাকুরি দেন তিনিই নেতৃত্বের আসন পেয়ে থাকেন। যে দেশ যত বেশী কমর্সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবে পৃথিবীর সব লোক সে দেশে যাওয়ার জন্য লাইন ধরবে। পাঁচশত বছর পূর্বে অন্য দেশের লোকেরা ভাগ্য পরিবতনের জন্য আমাদের দেশে আসতো আর এখন আমাদের দেশের সোনার ছেলেরা বিদেশে পাড়ি জমায় ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। প্রতি বছর আমাদের দেশের শত শত ছেলেরা লিবিয়া হতে ইতালি যাবার পথে ভূ-মধ্যসাগরে ডুবে প্রাণ হারায়। আমরা যদি ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তিতে সামাজিক ব্যবসা চালু করতে পারি তাহলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বিদেশীরাই আসবে আমাদের দেশে চাকুরি করতে।

আমাদের একজন মাহাথীর মোহাম্মদ/খোমেনীর মতো নেতা দরকার

আমাদের দেশের লোকেরা বিদেশে গিয়েও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল জিয়ার সৈনিক অন্য দল বঙ্গবন্ধুর সৈনিক। দেশের স্বাধীনতা উত্তর ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এই দুই মহান নেতা মানুষের মনের মণিকোঠায় এমনভাবে স্থান করে নিয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে সত্য ও গঠনমূলক সমালোচনা করাও দুষ্কর ব্যাপার। মাওলানা ভাসানী একবার বঙ্গবন্ধুকে আট আনা পয়সা দিয়ে একটি সাংগঠনিক কাজে নারায়ণগঞ্জে পাঠিয়েছিলেন। তখন ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের বাস ভাড়া ছিল চার আনা। নির্ধারিত কাজ শেষে তিনি মাওলানা ভাসানীকে আট আনাই ফেরত দেন। পয়সা ফেরৎ দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমি সাইকেলে গিয়েছি এবং ফেরৎ এসেছি কাজেই পয়সা খরচ হয়নি। এই রকম দৃষ্টান্ত বর্তমান প্রজন্মের রাজনীতিবিদদের মধ্যে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এতটাই সৎ লোক ছিলেন যে তার মৃত্যুর পর তার ব্যাংক হিসেবে মাত্র পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ছিল। বর্তমান বিএনপি ও আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু ও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শ থেকে যোজন যোজন মাইল দূরে অবস্থান করছে। শত চেষ্টা করলেও অদূর ভবিষ্যতে এই ব্যবধান কমবে না বরং বৃদ্ধি পাবে। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তার আদর্শ আর পৃথিবীতে থাকে না। বাংলাদেশে কয়েক ডজন ইসলামী দল আছে, অনেক বড় বড় মৌলানা আছেন যারা এই অপ্রিয় সত্য কথা বলতে সাহস করে না, যে কোনো ব্যক্তি যত মহানই হোক না কেন মৃত্যুর পর তার নীতি আর আদর্শ এই পৃথিবীতে থাকে না। মৃত্যুর পরে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির আদর্শই কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে আর সেটা হলো আমাদের প্রিয় রাসুল হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শ।

আমাদের দেশের লোকেরা অনেক মেধাবী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে তারা যদি সে দেশের রাজনীতি চর্চা করে তাহলে তারা খুব তাড়াতাড়ি সে দেশের এমপি-মন্ত্রী হতে পারবে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এ বিষয়ে বেশ কিছু সাফল্য পেয়েছে এমনকি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আমাদের দেশের বেশ কয়েকজন সংসদ-সদস্য রয়েছেন।

যে দেশের লোক যত বেশী খারাপ সে দেশের নেতারাও ততবেশী খারাপ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন তোমরা যত বেশী খারাপ হবে আমিও তোমাদের জন্য ততবেশী খারাপ শাসক নিয়োগ করব। দেশ স্বাধীনের পূর্বে ক্লাশের সবচেয়ে মেধাবী ছেলেরা হতো ক্লাশ ক্যাপ্টেন বা ছাত্র নেতা। দেশ স্বাধীনের পরে আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখলাম ক্লাশের সবচেয়ে খারাপ-দুশ্চরিত্র ও মেধাহীন ছেলেরা হচ্ছে ছাত্রনেতা। এই সংস্কৃতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। সেই কারণে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেছিলেন, 'যে সমাজ গুণীজনদের সমাদর করে না সে সমাজে গুণীজন জন্মায় না।' মেধাবীদের হাতে নেতৃত্ব যতদিন আমরা ফিরিয়ে দিতে না পারব ততদিন আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না। যে দেশে ৫০০ টাকা দিয়ে ভোট কিনতে পাওয়া যায় সে দেশে গণতন্ত্র মুক্তি পাওয়া না পাওয়া একই কথা। দুই ধরনের মানুষকে সাধারণত টাকা দিয়ে কেনা যায় না। নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ, যে শিক্ষা সে পরিবারের নিকট থেকে পেয়েছে। আর যে সব মানুষ, রাসুলের আদর্শের অনুসারী সে সব মানুষকে টাকা দিয়ে ক্রয় করা যায় না। জনগণকে ক্রয় করার জন্য রাজনীতিবিদদের অনেক টাকার প্রয়োজন আর সে কারণেই নেতারা দুর্নীতি করে সম্পদের পাহাড় গড়েন।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে দুর্নীতি আর রাজনীতি একটি অন্যটির পরিপূরক। একটি ছাড়া অন্যটি অসম্ভব। যে দেশে মেধাবীদের মূল্যায়ন হয় না, যে দেশে গুণীজনেরা সম্মান পায় না, যে দেশে মূর্খরা মঞ্চে বসে, যে দেশে চোরেরা গৃহস্থ ধরে এবং যে দেশে চাঁদাবাজদের কথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গ্রেফতার করা হয় সে দেশে আর যাই হোক আইনের শাসন কায়েম হতে পারে না। যে চাঁদাবাজরা একজন অবসরপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে চাঁদার জন্য ৮-১০ ঘন্টা আটকিয়ে রেখেছিল, পুলিশ সেখানে গিয়ে চাঁদাবাজদের গ্রেফতার না করে উল্টো চাঁদাবাজদের কথামতো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে গ্রেফতার করে জেলখানায় পাঠিয়েছিল। এ রকম ঘটনা হীরক রাজার দেশেও কোনোদিন ঘটেছে বলে আমার জানা নেই, আর এই কারণেই আমাদের দেশের মেধাবীরা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে আর কোনো দিনও ফিরে না আসার মানসিকতা। আর মেধাবীরা যদি দেশ ছেড়ে চলে যায়, তাহলে এই দেশ চালাবে কারা?

পৃথিবীতে সিঙ্গাপুরই একমাত্র দেশ যারা কিনা স্বাধীনতা না চেয়েও তারা তা পেয়ে গিয়েছিল। সিঙ্গাপুর ছিল মালয়েশিয়ার অংশ। ১৯৬৫ সনে

তখন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিল আব্দুর রহমান টিংকু। এই আব্দুর রহমান টিংকু একদিন ঘোষণা করলেন, 'সিঙ্গাপুরের লোকেরা যেহেতু পড়ালেখা জানে না, আর মাছ ধরা ছাড়া তারা অন্য কোন কাজও পারে না, সুতরাং আমরা তাদের দায়িত্ব নিতে পারব না।' তখন সিঙ্গাপুরের জাতির জনক লি কুন ইয়ে কেঁদে কেঁদে জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দিয়ে বলেছিলেন, 'আমরা পড়ালেখা জানি না বলে তারা আমাদের দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, আমি তোমাদের বিদেশে পাঠাবো পড়ালেখার জন্য। তোমরা পড়ালেখা শেষ করে দেশে এসে দেশ গড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবে।' বিশ্বের সেরা দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত ও পাকিস্তানের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সেরা দশে স্থান পায়নি। একদিন যে মালয়েশিয়া অশিক্ষিত হওয়ার কারণে যাদের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছিল তারাই তাদের বিশ্ববিদ্যালকে বিশ্বের সেরা দশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার মাত্র ছয় বছর আগে যে সিঙ্গাপুর স্বাধীন হয়েছে আজকে তাদের অবস্থান কোথায় আর আমাদের অবস্থান কোথায়? আবার তারা বিশ্বমানের হাসপাতাল করেছে। যেখানে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ধনী রোগীরা চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকেন। একদিনের অশিক্ষিত জেলে জাতি বিশ্বমানের হাসপাতাল আর বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়ে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। আমাদের ছেলেরা যেহেতু মেধাবী ও নৈতিকতাসম্পন্ন সুতরাং আমরাও পারব। মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ পেলে আমাদের দেশের ছেলেরাও বিশ্বমানের হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয় করে সিংঙ্গাপুরের মতো দেশের চেহারা পরিবর্তন করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

আমাদের দেশে যে গণতন্ত্র চালু আছে বা বিগত পঞ্চান্ন বছর এ দেশের মানুষ যে গণতন্ত্র দেখে এসেছে তাকে প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র বলা চলে না। এটাকে অনেকটা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলা যায়। দেশে নেতা তৈরী হোক এটা কোনো দেশের রাজতন্ত্রেরই কাম্য না। তারা চায় অনুগত ও বিশ্বস্ত চাকর তৈরী করতে। যে সব দেশে গণতন্ত্র আছে সে সব দেশের দিনমজুর বা রিকশা চালকের ছেলেরও সুযোগ আছে সে দেশের রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার। যে গণতন্ত্র ব্রিটেন ও আমেরিকাতে আছে আমাদের দেশে সেই গণতন্ত্র দরকার।

আমাদের দেশের গণতন্ত্র ও সমসাময়িক অবস্থা

পলাশীর প্রান্তরে ১৭৫৭ সনে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত যাওয়ার পর থেকেই বাঙালি জাতির জীবনে নেমে আসে ঘন অন্ধকার। আমরা স্বাধীন হয়েছি ঠিকই কিন্তু আমরা আলোর মুখ দেখি নাই। স্বাধীনতার জন্য বাঙালি জাতির মতো এত রক্ত পৃথিবীর আর কোনো জাতি দিয়েছে কিনা আমার জানা নেই। তারপরও আমরা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হতে পারি নাই। ১৮৫৭ সনে সিপাহী বিদ্রোহে আমরা হেরে গিয়েছিলাম সঠিক নেতৃত্বের অভাবে। এই প্রথম আমরা বুঝতে শিখেছিলাম আমাদের নেতৃত্বের প্রয়োজন। এর ফলশ্রুতিতে ১৮৮৫ সনে উপমহাদেশে প্রথম রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেস গঠিত হয়। ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পর পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠিত হয় এবং এই প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকায়। উপমহাদেশে দ্বিতীয় দল হিসেবে ১৯০৬ সনে ঢাকার আহসান মঞ্জিলে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা বঙ্গভঙ্গের কারণে খুব সংক্ষুব্ধ হয় এবং এর প্রতিবাদস্বরূপ কবি রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের দেয়া নাইট উপাধি বর্জন করেন। পশ্চিমবঙ্গের হরতালে অতিষ্ঠ হয়ে ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত ১৯১২ সনে তাদের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর করেন। জেলেদের গ্রাম কালিকটকে ইংরেজরাই প্রথমে রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে স্থানান্তর করেন কলকাতায়। তাদের কেন্দ্রীয় রাজধানী হাতছাড়া হলো এতে তাদের কোনো কষ্ট ছিল না, তারা পুলকিত হয়েছিল ঢাকাকে প্রাদেশিক রাজধানী হওয়া হতে বঞ্চিত হওয়াতে। অবশেষে ১৯১১ সনে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় এবং ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা হারায়।

১৯১৫ সনে স্যার সলিমুল্লাহর মৃত্যুর পরে মুসলিম লীগ দুর্বল হয়ে পড়ে অতঃপর ১৯৩৫ সনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মুসলিম লীগে পুনরায় যোগদানের মাধ্যমে তা পুনর্জীবিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, জিন্নাহ সাহেব ১৯১৩ সনে মুসলিম লীগে যোগদানের পর খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় না থাকার কারণে ১৯৩০ সনে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য লন্ডন চলে গিয়েছিলেন। উপমহাদেশের মধ্যে তখনকার দিনে সবচেয়ে মেধাবী এবং বোম্বে হাইকোর্টের ব্যারিস্টার ছিলেন মোহাম্মদ

আলী জিন্নাহ। মুসলিম লীগের নেতাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে দেশে ফিরে মুসলিম লীগের হাল ধরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। পাকিস্তানের জনগণের অকৃত্রিম ভালোবাসায় তিনি পাকিস্তানের জাতির জনক হিসেবে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হন।

ইংরেজরা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে রাসুলের সুন্নত অর্ধেক মানবো আর অর্ধেক মানবো না। আর মসজিদ হবে শুধুমাত্র নামাজ পড়ার জায়গা। রাসুলের জামানায় মসজিদ ছিল সমস্ত সমস্যা সমাধানের কেন্দ্রবিন্দু। মুসলীম লীগ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের কোনো ধর্মভিত্তিক দলই রাসুলের সুন্নত শতভাগ মানেনি বিধায় তারা সফলতার মুখ দেখেনি। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যতদিন আমরা এটা সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ ও অনুকরণ করতে না পারব মুক্তি ততদিন আসবে না। আমরা যারা রাসুলের সুন্নত শতভাগ অনুসরণের চেষ্টা করি তাদেরকে মৌলবাদী ট্যাগ লাগিয়ে অসম্মান করার চেষ্টা করা হয়।

১৯৭০ সনের পূর্বে এ দেশের জনগন কখনো জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পারেনি। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি আর পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে পাঁচ কোটি। ৩০০ আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ১৬২টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ১৩৮ আসন। ব্রিটিশ শাসনামলে শুধুমাত্র সমাজপতিরা ভোট দিতে পারতো। আব্বার কাছে শুনেছি ব্রিটিশ শাসনামলে আমাদের গ্রামে ভোটার ছিল মাত্র দুই জন। দাদা আর পন্ডিতুল্ল্যা সাহেব। সে সময় কিন্তু টাকার বিনিময়ে ভোট বেচাকেনা হতো না। আজকে নেতাদের দুর্নীতিগ্রস্থ বানিয়েছি আমরা। কেননা আমাদের ক্রয় করার জন্য নেতাদের অনেক টাকা দরকার। আর আল্লাহ বলেছেন যে জাতি যে রকম আমি সে জাতিকে সে রকম নেতা প্রদান করে থাকি। আমরা জনগন বারবার ভুল করে থাকি কিন্তু মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কখনো ভুল করেন না। আমাদের যোগ্য নেতাই তিনি বারবার আমাদের উপহার দিয়ে থাকেন। ভোট দিয়ে যদি আমরা কোনো অযোগ্য লোককে নির্বাচিত করে থাকি তাহলে ঐ নেতা যে পাপ করবে তার পাপের ভাগিদার কিন্তু আপনিও হবেন। সবসময় মনে রাখবেন আমাদের রব কিন্তু ন্যায় বিচারক। আমাদের রব যে ন্যায়বিচারক তা আপনারা আমার চেয়ে অনেক ভলো জানেন, তারপরও একটি উদাহরণ না দিয়ে পারছি না। পলাশীর প্রান্তরে

যারা বাঙালি জাতির সাথে তথা নবাব সিরাজ উদ্-দৌলার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তাদের সবার পরিণতিই হয়েছিল খুব ভয়াবহ এবং সেটা বিশ বছরের মধ্যেই হয়েছিল। যে জনগন পাঁচ শত বা এক হাজার টাকার বিনিময়ে তার ভোট বিক্রয় করে সে জনগনের ভোটের অধিকার থাকা আর না থাকার মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। বাংলাদেশের মধ্যে ঢাকা শহরে সবচেয়ে শিক্ষিত লোক বাস করে। ১৯৯১ সনে ডক্টর কামাল হোসেন নৌকা প্রতীক নিয়ে আর এসএ খালেক ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে একে অন্যের সাথে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছিলেন। সে সময় সবচেয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন হয়েছিল। ভোটে এসএ খালেক বিজয়ী হয়েছিলেন আর ডক্টর কামাল হোসেন পরাজিত হয়েছিলেন। ভোটের আগে জনসভায় এসএ খালেক ভাষণ দিয়েছিলেন, 'আপনারা কেউ ডক্টর কামাল হোসেনকে ভোট দিবেন না। ডক্টর কামাল হোসেন এত বড় ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও সে দেশের মানুষের কোনো চিকিৎসা করে না, সে শুধু বিদেশী মানুষের চিকিৎসা করে। ঢাকা শহরের শিক্ষিত মানুষরা ডক্টর আর ডাক্তারের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই বুঝে কিন্তু পাচঁশত টাকার কাছে বিক্রয় হওয়া এই সব ভোটারকে বুঝাবে কে?'

যেসব দেশে সত্যিকারের গণতন্ত্র আছে, সে সব দেশে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নেতা নির্বাচিত হয়। একজন দিনমজুর বা রিকশা চালকের ছেলেও নেতা হতে পারে যদি তার যোগ্যতা থাকে। আইনের শাসন ও ইনসাফের ভিত্তিতে যতদিন আমরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে পরিচালিত করতে না পারব ততদিন গণতন্ত্র মুক্তি পাবে না। বৃহৎ কল্যাণ সাধনের জন্য ছোট-খাটো ক্ষয়-ক্ষতি মেনে নিতে হয়। ভালো নেতা পেতে হলে হাজার টাকার লোভ সামলাতে হবে। এক সময় দেখা যেত জমিদারের ছেলেরা রাজনীতি করতে করতে একেবারে গরীব হয়ে যেত আর বর্তমানে দেখা যায় গরীবের ছেলেরা রাজনীতি নামের সোনার হরিণ পেয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে গিয়েছে। আর একবার যদি কেউ হাজার কোটি টাকার মালিক হয়ে যায় তাকে আর কোনো দিন পিছনে ফিরে তাকাতে হয় না। প্রথমে টাকা দিয়ে সে বড় দুই দলের যে কোনো একটির নমিনেশন বা প্রতীক কিনে, তারপর টাকা দিয়ে জনগনের ভোট কিনে। দুর্নীতির কোনো অভিযোগ যদি তার বিরুদ্ধে উঠে তাহলে সে সরকারি যে কোনো এজেন্সিকে টাকা দিয়ে ম্যানেজ করে। আমাদের

জাতীয় চরিত্র এমনভাবে ধ্বংস হয়েছে যে, টাকা দিলে হয় না এমন কাজ বাংলাদেশে নাই।

স্বয়ং আল্লাহ রক্ষা না করলে এখান থেকে আমাদের উত্তরণের কোনো পথ নেই। যখন কোনো কিছু চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে আবার ভালোর দিকে ধাবিত হয়। ভালো মানুষরা বর্তমান সমাজে অপমানিত হচ্ছে লাঞ্চিত হচ্ছে। আর ধান্দাবাজ দুষ্ট প্রকৃতির লোকরা সমাজে তথা অফিস আদালতে তাদের হীন স্বার্থ কায়েম করছে। আল্লাহর আইন আর সৎ লোকের শাসন কায়েমের মাধ্যমে আমরা আমাদের সোনার বাংলা গড়ে তুলব, হে আল্লাহ্ আমাদের শক্তি দিন।

রাজতন্ত্র বেশীরভাগ সময়ই দুর্বল নেতা উপহার দিয়ে থাকে

বেশীরভাগ মুসলিম দেশে রাজতন্ত্র বিরাজমান। আর সেই কারণে আজকে মুসলিম বিশ্ব নেতৃত্বের থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়েছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখা হতে আমরা যোজন যোজন মাইল দূরে অবস্থান করছি। ১৯৬৭ এবং ১৯৭৩ সনে সমস্ত আরব বসন্তের দেশগুলি একসঙ্গে লড়াই করেও ইসরাইলের সঙ্গে পারেনি। মুসলমানেরা ঘোড়ার যুদ্ধে খুব পারদর্শী থাকলেও আধুনিক প্রযুক্তির অভাবে তারা ক্ষেপণাস্ত্র বানানো তো দূরের কথা সেগুলি পরিচালনার ক্ষমতাও তাদের নেই। তবে সম্প্রতি সময়ে মুসলিম দেশগুলির মধ্যে শুধুমাত্র ইরান আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে কিছুটা এগিয়ে আছে।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় বলে যেতে পারতেন তাঁর অবর্তমানে খলিফা কে হবেন। প্রিয় রাসুল যদি ঘোষণা দিয়ে যেতেন তার অবর্তমানে কে খলিফা হবেন তাহলে এটা একটা রেওয়াজে পরিণত হতো। পরবর্তীতে এই ঘোষণার মাধ্যমে রাজতন্ত্রকে উৎসাহিত করা হতো, আর রাজতন্ত্র সব সময় দুর্বল নেতা উপহার দিয়ে থাকে। তাঁর অবর্তমানে খলিফা কে হবেন এটি যেহেতু তিনি আগে থেকে ঘোষণা দিয়ে যান নাই, এই ঘোষণা না দেয়ার মধ্যেই একটি শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে রাজতন্ত্র যেন কায়েম না হয়ে যায় সে কারণে তিনি পরবর্তী খলিফার নাম ঘোষণা করেন নাই। পরবর্তী খলিফা কে হবেন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হতে দেরী হওয়ার কারণে প্রিয় রাসুলের শাহাদৎবরণের পর দাফন সংক্রান্ত বিষয়ে তিন দিন বিলম্ব

হয়েছিল। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার বিষয়ে এরকম হিমালয়ের মতো অটল থাকার উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তাই আমরা আমাদের প্রিয় রাসুলকে গণতন্ত্রের জনক বলতে পারি। বেশীরভাগ মুসলিম দেশে রাজতন্ত্র বিরাজমান বলেই মুসলমানদের মধ্যে থেকে আর্ন্তজাতিক মানের নেতা তৈরী হচ্ছে না। মেধা আর যোগ্যতার ভিত্তিতে যতদিন নেতা নির্বাচিত না হবে ততদিন গণতন্ত্র মুক্তি পাবে না।

মুয়াবিয়া তার ছেলে এজিদকে পরবর্তী খেলাফত প্রধান হিসেবে নাম ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হন নাই, সে সময় বিভিন্ন প্রদেশে যারা নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাদেরকে দুইশত দিরহাম করে ঘুষ প্রদান করেছিলেন তার ছেলেকে সমর্থন করার জন্য। ইসলামী খেলাফতে এভাবেই রাজতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। যেসব পীর সাহেব তাদের জীবদ্দশায় নিজের ছেলেকে পীর হিসেবে ঘোষণা করেন, যারা দুনিয়ার সামান্য সম্পদ হারাতে চায় না তারা আসলেই সঠিক পথে আছে কিনা তা মহান আল্লাহ্ ভালো জানেন। মুয়াবিয়া ছিলেন ইসলামের চিরশত্রু আবু সুফিয়ানের ছেলে। মক্কা বিজয়ের পর প্রাণ বাচাঁনোর জন্য সুফিয়ান তার স্ত্রী ও বংশধরেরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মুয়াবিয়ার বংশধরেরা ৯০ বছর খেলাফত পরিচালনা করেন এবং হাজার হাজার মুসলমানদের হত্যা করেন।

ইসলামী খেলাফতে নেতা নির্ধারণের জন্যে যে বৈশিষ্ট রয়েছে তা অনুসরণ করা আমাদের ঈমানী দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ইসলামী খেলাফতে নেতা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করাটাই হলো তার প্রথম অযোগ্যতা। ইসলামী খেলাফতে নেতা হওয়া কোনো লাভজনক বিষয় নয় বরং এটা একটি গুরুদায়িত্ব। শেষ বিচারের দিন এই সমস্ত নেতাদের মহান রবের নিকট জবাবদিহি করতে হবে, তাদের বিন্দুমাত্র অবহেলার কারণে প্রজাতন্ত্রের কোনো প্রজা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা।

প্রত্যেক দেশ ও জাতির জন্য খেলাফতের শর্তানুযায়ী এমন লোক নেতা হওয়া প্রয়োজন যে বুদ্ধিমান, বালেগ, স্বাধীন, পুরুষ, সাহসী এবং প্রতাপশালী। তাছাড়া মুসলিম দেশের নেতা হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া আবশ্যক, ন্যায়পরায়ণ ও ইসলামী জ্ঞানে বিশেষভাবে দক্ষ হওয়া আবশ্যক। একজন সাধারণ মানুষ যে বিষয়টা এখন বুঝতে পারে, নেতারা যদি তার দ্বিগুণ সময় আগে বুঝতে না পারে তাহলে তার নেতৃত্বে না আসাই ভালো।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসনব্যবস্থা থেকে সারা বিশ্বের মুসলিম দেশগুলির শিক্ষা নেয়া উচিৎ। একবার পারস্য সেনাপতি হরমুজানকে মুসলিম সেনারা যখন বন্দী করে হযরত ওমর (রাঃ)-এর দরবারে হাজির করলেন, তখন তিনি খেজুর পাটিতে শুয়েছিলেন। পারস্য সেনাপতি কটাক্ষ করে বলেছিলেন তোমরা এত গরীব যে তোমাদের খলিফা খেজুর পাটিতে শুয়ে আছে। অর্ধ-পৃথিবীর বাদশা খেজুর পাটিতে শুয়ে আছেন আর্থিক অভাবের কারণে নয়, বরং ইসলামী খেলাফতের খলিফাদের অনাড়ম্বর জীবনযাপন করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য। তিনি এতটা হিসেবী ছিলেন যে, বেশী খরচ করার কারণে খালিদ বিন ওয়ালিদের মতো সেনাপতিকেও চাকুরি হতে অপসারণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি বলেছিলেন আমার খেলাফতে মানুষ তো দূরের কথা কোনো কুকুরও যদি অভুক্ত থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। তিনি রাতের অন্ধকারে লোকালয়ে ঘুরে বেড়াতেন তার খেলাফতে কেউ অনাহারে আছে কিনা সেটা স্বচক্ষে দেখার জন্য। তিনি যখন মৃত্যুপথযাত্রী সে সময় তার এক হিতাকাঙ্খী তাকে অনুরোধ করেছিলেন তার জীবদ্দশায় তিনি যেন তার ছেলেকে খলিফা ঘোষণা করেন। বিষয়টি শুনে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন এত বড় অন্যায় করে আমি মহান আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব? তার মৃত্যুর পরে কে খলিফা হবেন সে বিষয়টি নির্ধারণের জন্য তিনি ৬ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন। উল্লিখিত কমিটিই হযরত ওসমান (রঃ)-কে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব পালন শেষে নিজ পেশায় বা নিজ গ্রামে ফিরে যান কিন্তু আমাদের দেশে সেরকম কোনো সিস্টেম ডেভেলপ করেনি। একটি দলের নিবন্ধন দেয়ার সময় এ রকম শর্ত দেয় উচিৎ যে, কোনো ব্যক্তি দুই বারের বেশী দলীয় প্রধানের পদে থাকতে পারবে না। বেশীরভাগ দলের বছরের পর বছর কাউন্সিল হয় না, নেতৃত্ব ধরে রাখার এ যেন একটা মহোৎসব। অনেক নেতারা এটাকে পৈতৃক সম্পত্তি মনে করে। যেসব দল বছরের পর বছর কাউন্সিল করে না তাদের নিবন্ধন বাতিল করা উচিৎ। রাষ্ট্রীয় সংবিধানে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে কেউ দুই বারের বেশী প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবে না। নির্বাচনের পূর্বে পোস্টার লাগিয়ে পরিবেশ দূষণ করা যাবে

না। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় ৮-১০ স্থানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে খোলা মাঠে নিজ দলীয় এজেন্ডা তুলে ধরার মাধ্যমে সব দলের নির্বাচনী প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে কোনো প্রার্থী বেশী খরচ করার সুযোগ না পায়।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একমাত্র দল যারা গণতন্ত্রের চর্চা করে। যেখানে নেতার ছেলের নেতা হওয়ার সুযোগ নেই। আর নেতা হতে হলে নির্দিষ্ট পথ-পরিক্রমা পাড়ি দিয়ে নেতা হতে হবে। এখন প্রশ্ন আসতে পারে ব্রিটেন ও আমেরিকার গণতন্ত্রে নেতার ছেলে নেতা হওয়ার সুযোগ নেই কিন্তু আমাদের এই উপমহাদেশে নেতার ছেলে নেতা হওয়ার যে সংস্কৃতি চালু হয়েছে সেখান থেকে আমারা কীভাবে বেরিয়ে আসবো। মেধা আর যোগ্যতার ভিত্তিতে নেতৃত্ব নির্ধারিত হলে নেতার ছেলে আর যোগ্যতা ছাড়া নেতা হতে পারবে না। নেতা নির্বাচনে আমরা যদি একটি খেলাফত মডেল দাঁড় করাতে পারি তাহলে সেটির মাধ্যমে সারা বিশ্বের মুসলিম দেশগুলিকে একই সুতোয় বেঁধে ফেলা সম্ভব।

বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ আর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। ছাত্রজীবনে এই সব সুন্দর কথা পরীক্ষার খাতায় লিখে আমরা পরীক্ষার বৈতরণী পার হয়েছি। জীবনের বাস্তবতায় মনে হয় স্কুলের শিক্ষকরা যা শিক্ষিয়েছেন সব ভুল। শিক্ষা জীবনের সেই সিলেবাস আমাদের সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন আর এই সার্টিফিকেটের বিনিময়ে আমরা চাকরি করে খাই। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের চাকর হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে কিন্তু নীতি-নৈতিকতার কোনো শিক্ষা দিতে পারেনি।

১৯৮০ সনে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এক জনসভায় বলেছিলেন, 'আমরা ভারতবাসীরা কৃষি বিপ্লবে অংশ নিতে পারিনি, শিল্প বিপ্লবে অংশ নিতে পারিনি কিন্তু আগামীতে আসছে তথ্য বিপ্লব। আমরা যদি তথ্য বিপ্লবে অংশ নিতে না পারি, তাহলে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ভারতের নাম মুছে যাবে।' তথ্য বিপ্লবের চালিকা শক্তি হলো ইন্টারনেট। ভারত আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছে বলেই তারা বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল,

এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের চালকের আসনে বসতে সক্ষম হয়েছে।

ঘটনার ১৩ বছর পরে বা এক যুগ পরে আমাদের ইন্টারনেট নেওয়ার সুযোগ আসলো। ১৯৯৩ সনে অপটিক্যাল ফাইবার লাইন আমাদের দেশের কক্সবাজারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, যা আমরা বিনা পয়সায় নিতে পারতাম সেটি আমরা নিলাম না। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে বুঝালাম অপটিক্যাল ফাইবার লাইন নিলে দেশের তথ্য সব বিদেশে পাচার হয়ে যাবে। আসলে তথ্য পাচার হয়ে যওয়াটা মুখ্য বিষয় ছিল না। এখানে মুখ্য বিষয় ছিল বিনে পয়সায় অপটিক্যাল ফাইবার লাইন নিলে আমার তো কোনো লাভ হবে না। আমার পকেটে তো কোনো পয়সা যাবে না। এই একই অপটিক্যাল ফাইবার লাইন আমরা নিয়েছিলাম ২০০৪ সনে হাজার কোটি টাকা খরচ করে। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন প্রায় ২০ কোটি টাকা প্রিমিয়াম পেয়েছিল। এখানে প্রতীয়মান হয় যে, নীতিনৈতিকতা ও দেশপ্রেমবিহীন বিদ্যা পঙ্গু।

নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয় এই কারণে, ভ্যাগ্যিস পুরাতন সিলেবাসে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম, নইলে আমার ললাটেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতো। পরম করুণাময়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই এই কারণে যে আমাকে নতুন সিলেবাসে পড়তে হয়নি। আমি যখন চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ি তখন হঠাৎ করে দেখলাম তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত সব বই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। এরপর থেকে আমি যখন যে ক্লাসে উঠতাম ঠিক তার নিচের ক্লাসের বই পরিবর্তন হয়ে যেত। সবচেয়ে বড় কথা মদন মোহন তর্কলংকারের যে শিশু শিক্ষা পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, তা কোনো দিনই ভুলবার মতো নয়। ঐ বইয়ের প্রতিটি কথাই ছিল শিক্ষনীয়। দুই একটা উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হলো– 'কানাকে কানা বলিও না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না তাহলে তাঁরা মনে দুঃখ পাবে। সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারাদিন যেন আমি ভাল হয়ে চলি, আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে সেই কাজ যেন আমি করি ভাল মনে।' শিশু শিক্ষার সেই বই বাদ দিয়ে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, 'হাট টিমা টিম টিম, তারা মাঠে পাড়ে ডিম, তাদের খাড়া দুটো শিং, তারা হাট টিমা টিম টিম।' বাস্তবে এই ধরনের কোনো প্রাণী পৃথিবীতে কখনো কোনোদিন ছিল কিনা এ বিষয়ে কোনো সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায়নি। যিনি এই কবিতাটি লিখেছেন, তার নাম ঠিকানা জানা থাকলে অনুগ্রহ করে

জানাবেন। আমি তাকে শুধু একটি কথাই জিজ্ঞেস করব কি যাদুর বলে আপনার এই রকম অখাদ্য লেখা পাঠ্যবইয়ে স্থান পেল। একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য তাদের নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ধ্বংস করাই যথেষ্ট। সিলেবাস পরিবর্তনের নামে সেই কাজটি করা হয়েছে খুব সূক্ষভাবে। ষড়যন্ত্র এখনো থেমে নাই, আমাদের ভবিষ্যৎ জেনারেশনকে পঙ্গু করার জন্য প্রতিনিয়ত সিলেবাস পরিবর্তন করা হয়। বর্তমানে প্রচলিত যে শিক্ষা ব্যবস্থা তাতে শত ভাগ লোক শিক্ষিত হলেও লাভ নেই। কেননা জীবনের সঙ্গে সর্ম্পকহীন বিদ্যা পঙ্গু। আর আমাদের সিলেবাস পরিবর্তনের নামে জাতিকে পঙ্গু করে দেওয়ার কাজ চলছে প্রতিনিয়ত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামের ইতিহাসের সিলেবাসসমূহে সম্রাট আকবরের ইতিহাস খুব গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে স্থান পায়। যেখানে সম্রাট আকবর আদৌ মুসলমান ছিল কিনা যেটি প্রশ্নবিদ্ধ ব্যাপার। ইসলামী খেলাফতের বিষয়গুলো ইসলামের ইতিহাসে প্রাধান্য পাওয়ার কথা থাকলেও সেটিকে সব সময় গুরত্বহীনভাবে দেখা হয়।

আমাদের জাতিকে সৎ ও চরিত্রবান জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে, নীতি নৈতিকতাসমৃদ্ধ, ধর্মভিত্তিক ও শিক্ষনীয় বিষয়সমূহ সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের শিশুরা যেন দেশপ্রেমিক ও নীতিনৈতিকতাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে দেশ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে এবং পাশাপাশি আগামী দিনের বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে পারে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান– এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ বা সংশয় নেই। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ধর্মের পাশাপাশি সমাজনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি ও অর্থনীতির বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। বেশীরভাগ মুসলমানই ধর্মটাকে ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ধর্মকে মসজিদের ভিতরে সীমাবদ্ধ রেখে আমরা পশ্চিমা সংস্কৃতিতে পরিবার-পরিজন পরিচালনা করছি। অর্থাৎ আমরা ধর্মের অর্ধেক মানছি আর অর্ধেক মানছি না। আমরা যারা ধর্মটাকে পুরোপুরি পরিপালন করার চেষ্টা করছি, তাদেরকে আমরা অপবাদ দিচ্ছি মৌলবাদী হিসেবে। পরকালে আমরা যদি রাসুলের সাফায়েত পেতে চাই তাহলে ইসলামকে

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে পরিপালন করতে হবে। দুনিয়াবী স্বার্থের মোহে কিছু অংশ মানবো আর কিছু অংশ মানবো না তা হবে না। রাসুলের জামানায় মুনাফেকরা এই কাজ করতো, তারা কাফেরদের বলতো আমরা তোমাদের সাথে আছি আবার মুসলমানদের বলতো আমরা তোমাদের সাথেই আছি। পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনা বাদ দিয়ে খাঁটি মুসলমানদের মৌলবাদী অপবাদ না দিয়ে আসুন আমরা সবাই মিলে নতুন ইসলামী বিশ্ব গড়ি। ছোটবেলা থেকেই আমি একজন সমাজতান্ত্রিক মানসিকতার মানুষ। সমাজতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। ১৯৯০ সনে সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্র পতনের হিড়িক পড়ে যায়। আমি বুঝতে পারি আমি ভুল পথে আছি এবং চিন্তা করতে থাকি সঠিক পথ কোনটি। অবশেষে আমি বুঝতে পারলাম প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথই একমাত্র সঠিক পথ। আমাদের দেশের ৯০% জন লোক মুসলমান। কিন্তু ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মানি এমন লোকের সংখ্যা ২৫% বেশী হবে না।

১৯৭১ সনে ইসলামী দলগুলোর পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করার কারণে আজকে বাংলাদেশে ইসলামী দলগুলোর এই অবস্থা। ইসলাম সত্য ধর্ম, কোনো মুসলমান সত্যের বিপক্ষে অবস্থান নিলে প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিরুদ্ধেই অবস্থান নেয়া হয়। যেখানে আল্লাহর অনুগ্রহ থাকে না, আর মহান রবের অনুগ্রহ বঞ্চিত হওয়ার কারণে বিগত পঞ্চান্ন বছর ইসলামী দলগুলোর অনেক ভঙ্গুর পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। গণভোটে বিজয়ী দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে এটাই গণতন্ত্রের ভাষা, গায়ের জোরে গণতন্ত্র কায়েম করা যায় না। ১৯৭১ সনে জন্মগ্রহণ করা সেই ছেলেটির বয়স আজকে পঞ্চান্ন বছর। যাকে কিনা ইসলামের পক্ষে কথা বলার কারণে রাজাকার তকমা লাগিয়ে ঘায়েল করা হয়। ইসলামী দলগুলো স্বীয় হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য একজন আলেম আর একজন আলেমকে কাফের বলতেও পিছপা হয় না। প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সা:) এর প্রতি পূর্ণ ঈমান আনার মাধ্যমেই সব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। আমরা প্রতিটি সমস্যা সমাধান করার জন্য যদি রাসুলের নির্দেশিত পথকে অনুসরণ করতে পারি তাহলে সব ইসলামী দলগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট থাকবে।

ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মানি এই ধরনের লোকের সংখ্যা মাত্র ২৫%। এই দেশের ৩৫% লোক বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী আবার ৩৫% লোক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে বিশ্বাসী আর বাকী ৫% লোক বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থেকে হাজার মাইল দূরে অবস্থান করছে আর বিএনপিও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শ থেকে হাজার মাইল দূরে অবস্থান করছে। ভবিষ্যতে এই ধরনের ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু কোনোক্রমেই এই ব্যবধান কমবে না। একজন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আদর্শ আর পৃথিবীতে থাকে না। যেমনটি থাকেনি মার্কসবাদ লেলিনবাদের মতবাদ। কিয়ামত পর্যন্ত শুধুমাত্র একটি জীবন বিধানই টিকবে আর সেটি হলো আমাদের প্রিয় নবীর নির্দেশিত জীবনবিধান। তিনি একদিকে ছিলেন রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজনীতিবিদ, সমরনীতিবিদ সর্বোপরি ইসলামী খেলাফতের মহানায়ক ও দু-জাহানের বাদশা। ইহকাল ও পরকালে তিনি ছাড়া অন্য কোনো বাদশাহের বাদশাহী চলবে না।

সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন আওয়ামী লীগ আর বিএনপি এক ঘাটে পানি খাবে ইসলামী দলগুলোর জয়যাত্রা ঠেকানোর জন্য। ইসলামী দলগুলো ভুল রাজনীতি করার কারণে তারা এতদিন অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। সঠিক পথে না চলার কারণে তারা মহান রবের অনুগ্রহ হতেও বঞ্চিত হয়েছে। এখন সময় এসেছে জনগণের মধ্যে সঠিক বার্তা পৌঁছে দেয়ার। ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসুলের নির্দেশ মেনে চলতে হবে বা নিজের খেয়াল খুশী মতো চলা যাবে না, এই বার্তাটি সাধারণ জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্বের অংশ। রাসুলের বার্তা সাধারণ জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেয়া নফল ইবাদতের সামিল। যেহেতু আর কোনো নবী বা রাসুল আসবে না সেহেতু রাসুলের বাণী সাধারণ জনগণের মধ্যে পৌঁছানোর দায়িত্ব উম্মতে মোহাম্মদীর। এই দায়িত্ব শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না। পৃথিবীর সব ধর্মের সব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে রাসুলের নীতি ও আদর্শ, কেননা তিনি এসেছিলেন সারা বিশ্বের সব মানুষের মানবতার মুক্তির দূত হিসেবে। আমরা যে যেখানে পারি যতটুকু পারি সমাজের সর্বস্তরে সব ধর্মের মানুষের নিকট রাসুল (সাঃ)-কে বিশ্ব মানবতার মূর্ত প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করতে

যেন কুণ্ঠাবোধ না করি। যে আদর্শের চর্চা শুধুমাত্র ইহকালের মন্ত্রী, এমপি হওয়ার জন্য বা ভালো থাকা-খাওয়ার জন্য করা হয়, সে আদর্শ কখনো মুক্তির পথ হতে পারে না। রাসুলের আদর্শের পরিবর্তে যারা ব্যক্তির আদর্শ চর্চা করেন তারা ইসলামের অর্ধেক মানেন আর অর্ধেক মানেন না। যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, সেহেতু এটিকে সম্পূর্ণভাবে মানতে হবে। ইসলামী দলগুলো ভুল করতে পারে বা তাদের নেতারা ভুল করতে পারে বা মৌলানারা ভুল করতে পারে, তাদের ভুলের কারণে আপনি যদি অভিমান করে ইসলামী আদর্শ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন তাহলে আপনি নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সা:) শিক্ষাটাকে কত বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন সেটা তার এই কথার মাধ্যমে বুঝা যায়। তিনি বলেছেন শিক্ষার জন্য তোমরা প্রয়োজনে চীন দেশে যাও। অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য তিনি অন্য ধর্মের দেশ চীনে যাওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। তখনকার দিনে চীন দেশকে সব চেয়ে দূরের দেশ মনে করা হতো। রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র মুখ থেকে চীনের নাম কেন বেরিয়েছিল আমি জানি না, তবে ২০২৫ সনের যুদ্ধে চীনের তৈরী অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে পাকিস্তান ও ইরান দুই প্রতিবেশী দেশ সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। আর তাছাড়া আজকের বিশ্ব মোড়ল আমেরিকা নামক দেশটার তখন জন্ম হয়নি। ব্রিটেন যে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশ্ব দরবারে শিক্ষিত জাতি হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন, সেই ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ও তখন ছিল না। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় বাংলাদেশের লোক শতভাগ শিক্ষিত হলেও কোনো লাভ হবে না। কেননা এই দেশের সবচেয়ে খারাপ কাজ (আকাম-কুকাম) আমরা শিক্ষিত লোকেরা করে থাকি। আমাদের কৃষক-শ্রমিক-দিনমজুর ও খেটে খাওয়া মানুষরা তেমন কোনো খারাপ কাজ করে না বা তাদের খুব বেশী খারাপ কাজ করার সুযোগও নেই। দেশের খেটে খাওয়া মানুষরা বিদেশে চাকরি করে কোটি কোটি ডলার রেমিট্যান্স দেশে নিয়ে আসছে। পক্ষান্তরে মানুষরূপী জানোয়ারেরা বা শিক্ষিত কুলাঙ্গারেরা দেশের ডলার বিদেশে পাচার করে তারা বিদেশের মাটিতে রাজপ্রাসাদ বানাচ্ছে।

১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধে ঐসব খেটে খাওয়া মানুষরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছে। কেননা তারা ঐ মুহূর্তে নিজের জীবনের চেয়ে দেশকে বেশী ভালোবাসতে পেরেছে। আর শিক্ষিত লোকেরা যুদ্ধ করেছে জীবন বাঁচিয়ে। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে ঐসব শিক্ষিত লোকেরা স্বাধীনতার ফসল ঘরে তুলেছে এমনকি কেউ কেউ লুটপাট করতেও পিছপা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় মেজর র‍্যাংকের কোনো কর্মকর্তা শহীদ হয়েছেন বলে আমার জানা নাই। শহীদ হয়েছেন সাধারণ সৈনিক ও সাধারণ মানুষরা। সর্বোপরি সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলছি, মুক্তিযুদ্ধে কারও অবদানকে ছোট করার জন্য আমি বলছি না, আমি বলছি প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরার জন্য। সুতরাং নির্দ্বিধায় আমরা এ কথা বলতে পারি যে, অশিক্ষিত খেটে খাওয়া মানুষেরা যুদ্ধ করেছে জীবন বাজি রেখে আর শিক্ষিত লোকেরা যুদ্ধ করেছে জীবন বাঁচিয়ে। ঠিক একইভাবে নব্বইয়ের এরশাদ পতনের আন্দোলনে, জুলাই আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাত্র শহীদ হয়নি। কিন্তু আন্দোলনের ফসল তারা ঠিকই সময় মতো ঘরে তুলেছেন। আন্দোলন করার সময় তারা জীবন বাঁচিয়ে আন্দোলন করে আবার আন্দোলনের ফসল ঘরে তোলার সময় তারা জীবন বাজি রেখে সেই আন্দোলনের ফসল ঘরে তোলে। আমার ছাত্রজীবনে আমি দেখেছি চাঁদার টাকা ভাগাভাগি করতে গিয়ে নিজেরাই নিজের দলের ছাত্রকে খুন করে পরদিন ক্যাম্পাসে মিছিল বের করতো আমার ভাই মরলো কেন খুনী এরশাদ জবাব চাই? এ যেন উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর এক অসাধারণ প্রয়াস। আমাদের গ্রামের লোকেরা এই ধরণের ঘটনাকে বলতো, গরু মরলো গড়াত আর দোষ হলো মুন্নার ...?

আজকে তারাই আমাদের এমপি-মন্ত্রী, তারাই দেশ চালায়, তাদের কাছে ভালো কিছু আশা করা অরণ্যে রোদন মাত্র। আর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, তোমরা যেরকম জাতি আমি তোমাদের জন্য সে রকম শাসক নিয়োগ করি। অর্থাৎ দেশের শাসক ভালো পেতে চাইলে আমাদের নিজেদের আগে ভালো হতে হবে। ভোটের সময় এক হাজার টাকার বিনিময়ে ভোট বিক্রয় করে ভালো নেতা প্রত্যাশা করা যায় না। মেধা আর যোগ্যতার ভিত্তিতে নেতৃত্ব নির্ধারিত হয় না বলেই আমরা কোন কাজে সফল হতে পারি না। বাংলাদেশের বৃহৎ দুটি পরিবারতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল টাকার বিনিময়ে যেভাবে নমিনেশন বিক্রয় করে, তাদের নিকট থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না। এই দেশের ৭০% লোক

এই দুই দলকে অন্ধভাবে সমর্থন করে বলেই তারা নিজেকে রাজপরিবার মনে করে। সেদিন খুব বেশী দূরে নয় যেদিন চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংঘঠিত হবে। রাজনীতিতে চাঁদাবাজি যদি না থাকে তাহলে বাংলাদেশের ৯৫% লোক রাজনীতি করা ছেড়ে দিবে। বর্তমানে চাঁদাবাজি হলো পুজিবিহীন সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলতে যতদিন আমরা না শিখবো ততদিন আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না।

দেশপ্রেমবিহীন এই শিক্ষাব্যবস্থা দেশের জন্য কোনোদিন কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। আমাদের শিক্ষার সিলেবাস যুগপোযোগী করে ও আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে প্রণয়ন করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হতো, নিশ্চয় এই ইতিহাস আপনারা এতদিনে ভুলে যেতে পারেন। এশিয়ার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথম চল্লিশের দশকে অক্সফোর্ডের সিলেবাস চালু করার মতো সাহস দেখিয়েছিল। এক বছরের বেশী সময় সেই সিলেবাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু রাখা সম্ভব হয়নি। কেননা তখনকার ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের মান বিলো স্ট্যান্ডার্ড হওয়ার কারণে ঐ সিলেবাস কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। তবে আমি একান্ত আশাবাদী বর্তমান সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অক্সফোর্ডের সিলেবাস ফলো করার মতো যোগ্যতা রাখে। তখনকার দিনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখার মান কি রকম ছিল একটি উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা কোন ছাত্র আইসিএস পাশ করতে পারেনি। তবে আশার বিষয় হলো বর্তমান যুগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাশ করা শত শত শিক্ষার্থী বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যাপনা করে দেশের মুখ উজ্জল করছেন। নীতিনৈতিকতার শিক্ষা দিতে পারে এমন সিলেবাস প্রণয়নের মাধ্যমে অপার সম্ভবনার দেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে বিশ্ব দরবারে নেতৃত্বের আসনে দেখতে পারবো ইনশাআল্লাহ। অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয় সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত আছে তা সিলেবাস থেকে বাদ দিতে হবে। আমার মেয়ে হলিক্রস স্কুল ও কলেজে পড়ার কারণে সেখানে অভিভাবক হিসেবে আমার পদাচারণের সুযোগ হয়েছিল। সেখানে বাচ্চাদের অনেক নীতিনৈতিকতার শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে, একই দেশের মধ্যে তারা পারলে আমরা পারি না কেন?

আমাদের চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন করতে হবে

আমরা যখন কোনো খারাপ কাজের কথা চিন্তা করি তখন যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঐ খারাপ কাজ না করি ততক্ষণ আমাদের মুনকার-নাকির তা লিপিবদ্ধ করেন না। পক্ষান্তরে আমরা যদি কোনো ভালো কাজের কথা চিন্তা করি তখন চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তার প্রতিদান পেয়ে যাই। সুতরাং ভালো চিন্তা করতে কোনো টাকা লাগে না। আর টাকা খরচ না করেই আমরা অশেষ পুণ্যের অধিকারী হতে পারি। সুতরাং, এখন থেকে আমরা সব সময় মানুষের, সমাজের, দেশের তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণের কথা চিন্তা করব। কেননা আমাদের রাসুল (সাঃ)-কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পাঠিয়েছিলেন সারা বিশ্বের সব দেশের সব মানুষের জন্য। আমরা যত বড় পাপ করি না কেন তার বিচার হবে, আমাদের মৃত্যুর পরে কিন্তু আমার কথায়, কাজে ও আচরণে মানুষ তো দূরের কথা, যদি কোনো প্রাণীও কষ্ট পায় তাহলে তার বিচার হবে এই পৃথিবীর মাটিতেই। একজন মানুষ যখন অন্য কোন মানুষের হক নষ্ট করে, তখন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঐ লোককে ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ক্ষতিগ্রস্ত লোক তাকে ক্ষমা না করেন। পৈতৃক জায়গা-জমি বণ্টনের সময় যারা অংশীদারকে ঠকায় তাদের পরিণাম কখনো ভালো হয় না। কারও ক্ষতি করে কেউ কখনো সফলকাম হতে পারে না। আর কারও ক্ষতি করার মাধ্যমে মানুষ যে পাপ করে, তার প্রায়শ্চিত্ত কখনো সমান হয় না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত সবসময় দ্বিগুণ বা তিনগুণ হয়ে থাকে।

আমরা কারও উপকার করতে না পারি অসুবিধা নেই, কিন্তু কোনোক্রমেই যেন কারও ক্ষতি না করি। আমরা সবসময় চেষ্টা করব মানুষের উপকার করার। আপনি যে লোকের উপকার করলেন সে লোক আপনার কোনো উপকারে আসতেও পারে আবার নাও পারে কিন্তু আপনার বিপদের সময় এমন লোক আপনার পাশে দাঁড়াবে যাকে আপনি কখনো দেখেননি বা চেনেন না। প্রতিটা উপকার করতে হবে নিঃস্বার্থভাবে ও ইনসাফের ভিত্তিতে। ধরে নিলাম আপনি খুব ক্ষমতাধর ব্যক্তি, এলাকার কোনো গরীব ছেলে আসলো সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির তদবির

করার জন্য। আপনার ফোনের কারণে ঐ গরীব ছেলেটির চাকরি পেয়ে গেল। এলাকার মানুষের মুখে মুখে রটে গেল, আপনার ক্ষমতার কথা, সবাই আপনাকে ধন্য ধন্য করতে লাগল কিন্তু আপনি কি একবার ভেবে দেখেছেন? আপনার এই অনধিকার চর্চার জন্য যে মেধাবী ছেলেটি চাকরি পাওয়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত হলো, তার আপনি কত বড় ক্ষতি করলেন? সুতরাং, আমাদের সকলের এই ধরনের উপকার করা হতে বিরত থাকা উচিৎ। একজনের উপকার করতে গিয়ে যদি অন্যজনের ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে এই ধরনের উপকার না করাই ভালো। অথচ এই ধরনের অন্যায় বা পাপকে আমরা কোনো কিছু মনেই করি না। অর্থাৎ এই ধরনের সামাজিক অপরাধ আমাদের রক্তের সাথে মিশে গেছে। স্কুলে ভর্তি করানোর সময় আমরা সবাই সন্তানদের বয়স ২-৩ বছর কমিয়ে দিয়ে থাকি। কোনো অভিভাবক এটাকে অন্যায় মনে করে না। বায়ুর সাগরে বাস করে আমরা যেমন বায়ুর অস্তিত্ব সর্ম্পকে সচেতন নই, তেমনিভাবে মিথ্যার সাগরে বাস করে মিথ্যাটাকেও আমরা স্বাভাবিক ঘটনা মনে করি বা মিথ্যাটাকে অন্যায় মনে করি না। আমরা যদি আল্লাহকে রিযিকের মালিক মনে করি তাহলে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। বয়স কম দেয়ার কারণে আপনার সন্তান ২-৩ বছর বেশী চাকরি করতে পারবে। এই ২-৩ বছরের রিযিক হালাল হবে না। আর রিযিক যদি হালাল না হয় তাহলে ইবাদত-বন্দেগিও কবুল হয় না। সর্বোপরি রিযিকের মালিক আল্লাহর উপর আপনি আস্থা রাখতে পারছেন না বিধায় আপনি আপনার সন্তানের বয়স ২-৩ বছর কমিয়ে দিচ্ছেন। অন্য ধর্মের লোকেরা শুধুমাত্র নীতিনৈতিকতার কারণে বয়স চুরি করছে না। আর আমরা মুসলমানেরা রিযিকের মালিক আল্লাহ জানার পরও আমরা আল্লাহর উপর আস্থা রাখতে পারছি না।

আমার প্রকৃত বয়সের চেয়ে সার্টিফিকেটের বয়স ৩ মাস বেশী। অর্থাৎ আমি ৫৯ বছর পূর্তির ৩ মাস আগেই অবসরে যাব। এটি নিয়ে আমার কোনো আপসোস নেই, আমি মনে করি আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। আমরা ৩ ভাইয়ের মধ্যে ২ ভাই চাকরিজীবি। আমার বড় ভাইয়েরও প্রকৃত বয়সের চেয়ে সার্টিফিকেটের বয়স ৩ মাস বেশী এবং তিনি এখন অবসর জীবনযাপন করছেন। এই সামাজিক অপরাধের ধারাবাহিকতায় আমিও একজন অপরাধী, কেননা আমিও আমার ছেলে-মেয়েদের বয়স ২ বছর কমিয়ে দিয়েছি। এখন আমার ছেলে আমাকে প্রশ্ন

করে, আব্বু তুমি আমাদের বয়স কেন কমিয়েছ? দাদা কি তোমার বয়স কমিয়ে দিয়েছিল? আমি বললাম না, তোমার দাদা আমার বয়স কমায়নি। এই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের অসিয়ত করবো, তোমরা যদি সরকারি চাকুরি করো তাহলে অবসর গ্রহণের দুই বছর আগেই স্বেচ্ছায় অবসরে যাবা, তাহলে তোমাদের রিযিকটা আর হারাম হবে না। আমার সন্তান বলে আমি বলছি না, যেটি প্রকৃত সত্য সেটিই বলছি। কোটা আন্দোলনের কয়েক বছর পূর্বে আমার সন্তানরা যখন নবম শ্রেণির ছাত্র তখন রেজিস্ট্রেশনের সময়, আমি আমাদের স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে রাজশাহীর নাম দিতে বলেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল জেলা কোটার সুবিধা পাওয়া। এখানে আমার ছেলে-মেয়েদের যুক্তি হলো, 'আমরা ঢাকায় জন্মেছি, ঢাকার স্কুলে পড়ালেখা করেছি, আমরা কেন রাজশাহীর কোটা সুবিধা নিতে যাব, এটি আমাদের জন্য হালাল হবে না।'

আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে ১৯৯০ সনের ডানা কাপ গ্রোথিয়া কাপের কথা, এটি ছিল অনুর্ধ্ব ১৪-১৬ বছরের ছেলেদের ফুটবল খেলা। যেখানে ব্রাজিলের মতো বিশ্ববিখ্যাত টিমকে আমাদের দেশের ছেলেরা চার শুন্য-পাঁচ শুন্য গোলে হারিয়ে বাজিমাত করেছিল। এখানে রহস্যটা কি ছিল জানেন? আমাদের অনুর্ধ্ব ১৪ টিমে ১৪ বছরের কেউ ছিল না আবার একইভাবে অনুর্ধ্ব ১৬ টিমে ১৬ বছরের কেউ ছিল না। আমাদের ছেলেরা ছিল সবাই ৪-৫ বছরের বড়, যার ফলে ইউরোপ আমেরিকার ঐসব বিশ্ববিখ্যাত টিমকে এত সহজে হারানো সম্ভব হয়েছে। আমরা সবকিছু নিয়ে রসিকতা করতে পারি কিন্তু অন্তত কারও জন্ম নিয়ে রসিকতা করা উচিৎ না।

রিযিকের মালিক আল্লাহ, এই চরম সত্য আমরা সবাই জানি এবং মানি কিন্তু কেউ আমল করি না। যদি আমল করতাম তাহলে আমরা আমাদের সন্তানের বয়স কমিয়ে দিতাম না। আল্লাহ যে রিযিকের মালিক এই চরম সত্যটি অন্য ধর্মের লোকেরা যতটা আমল করে আমরা মুসলমানেরা তা করি না। মিথ্যা আমাদের রক্তের সাথে এমনভাবে মিশে গিয়েছে, যার ফলে বাচ্চাদের বয়স কমানোকে আমরা আর পাপ মনে করি না। যে জাতির জীবন শুরু হয় মিথ্যা দিয়ে সে জাতির ছেলেরা দেশ বিক্রয় করে দিবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু না না না? আমাদেরকে বদলাতে হবে আমাদের চিন্তাভাবনা পরিবর্তন করতে হবে। কয়েক শত বছর গোলামী করতে করতে আমরা ভুলেই গিয়েছি, আমরা একদিন

মালিক ছিলাম। ৫০০ বছর পূর্বে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য অন্য দেশের মানুষেরা এই দেশে আসতো। আজকে আমাদের দেশের ছেলেরা ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য অন্য দেশে যায়। যে যুবসমাজ দেশের শক্তি তারা আর দেশে কোনো কাজ করতে চায় না, তারা বিদেশে গিয়ে কাজ করাকে বেশী নিরাপদ মনে করে। আমাদের দেশে আইনের শাসন নেই, মেধা আর যোগ্যতার মূল্যায়ন নেই, যার ফলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত কোনো শ্রেণিই আর এই দেশে থাকতে চাচ্ছে না। প্রতি বছর আমাদের দেশের শত শত ছেলেরা ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যাবার পথে সাগরের পানিতে ডুবে প্রাণ হারায়। আইনের শাসন যে দেশে থাকে না সে দেশের মানুষ আল্লাহর অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হয়। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে জরুরি হয়ে গিয়েছে আমাদের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন করা। যে পথে হেঁটে সিঙ্গাপুর আজ বিশ্বমানের হাসপাতাল আর বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়েছে ঠিক একই পথে হেঁটে আমরা বিশ্ব দরবারে মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে নিজেদেরকে তুলে ধরতে চাই।

প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর সময় আমরা যেন একবার চিন্তা করি, সারাদিনে আমি কোনো ভালো কাজ করেছি কিনা যা মানুষের কল্যাণে আসতে পারে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হিসেবে মানুষের কল্যাণে কাজ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। মানুষ হিসেবে ইউরোপ আমেরিকার মানুষরা মনে করে তারা যা আয় করে তা সর্ম্পূণটা যদি খেয়ে ফেলে দেয় তাহলে সেটা কোনো মানুষের কাজ হলো না। তাই তারা তাদের আয়ের একটি অংশ চ্যারিটিতে দান করে, আর আমাদের দেশের এনজিও ব্যবসায়ীরা সেই টাকা নিয়ে এসে ব্যবসা করে।

রাজনীতি ভোগের জন্য নয়, ত্যাগের জন্য বা আয়ের জন্য নয় ব্যয়ের জন্য। কোনো দলের দৃশ্যমান কোনো আয় না থাকলে তাদের রেজিস্ট্রেশন দেয়া উচিৎ না। চাঁদাবাজি আর ধান্দাবাজি যে দলের আয়ের উৎস সে সব দল কোনোদিন মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে পারবে না। চাঁদাবাজি আর ধান্দাবাজি যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে বাংলাদেশের ৯৫% দল রাজনীতি ছেড়ে দিবে। বিদেশী গোয়েন্দাদের টাকায় যারা দল চালায় তারা কখনো এ দেশের মানুষের কল্যাণ চায় না। তাদের রাজনীতিকে রাজনীতি না বলে পেটনীতি বললেই বেশী মানায়।

ব্যবসা নেই, জমিদারী নেই, চাকরি নেই এবং দৃশ্যমান কোনো আয় নেই, অথচ রাজনীতির নামে তারা দুই হাতে টাকা উড়ায়। যতোদিন এই

সব অদৃশ্য আয় বন্ধ না হবে ততদিন গণতন্ত্র মুক্তি পাবে না। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে যারা টাকা দিয়ে ডাইনিং-এ খেতে পারেনি, আজ তারা রাজনীতি নামক সোনার হরিণের বদৌলতে দুই হাতে টাকা উড়াচ্ছে। এইসব অনাচার অচিরেই বন্ধ হওয়া উচিৎ। সুষ্ঠু রাজনীতি না থাকার কারণে সমাজের পরতে পরতে অন্যায় ও অবিচার মরণব্যাধি ক্যান্সারের মতো বাসা বেঁধেছে। ক্যান্সার হলে শরীরের যে কোনো অংশ কেটে ফেলতে হয়, তেমনিভাবে পচনশীল রাজনীতি বাদ দিয়ে কল্যাণের রাজনীতি শুরু করতে হবে। বৃহৎ কল্যাণ সাধনের জন্য ছোটোখাটো ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিতে হয়। এতদিন রাজনীতিকে যারা অর্থ উপার্জনের ও ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন তাদের অনেক ক্ষতি হবে ঠিকই কিন্তু সমাজ উপকৃত হবে। দেশের বিচার ব্যবস্থাকে স্বাধীনতা দিতে হবে। সরকারি দল খুন করলেও কোনো অপরাধ হয় না আর বিরোধী দল অপরাধ না করেও দোষী সাব্যস্ত হয়। চাকরি হারানোর ভয়ে বিচারকরা সঠিক বিচার করতে পারে না। পুলিশ বাহিনী থেকে শুরু করে একই অবস্থা হয় সরকারি প্রতিটা সেক্টরে। সবাইকে অঙ্গীকার করতে হবে বিচার ব্যবস্থার উপর যেন কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করা না হয়।

আগে ক্লাশের সব চেয়ে মেধাবী ছেলেরা রাজনীতি করতো আর এখন ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্টু ও চরিত্রহীন ছেলেরা রাজনীতি করে। ছাত্রত্ব শেষ হবার ১০ বছর পরেও তারা ক্যাম্পাস আঁকড়ে পড়ে থাকে। এইসব আবু ভাইদের রাজনীতি যতদিন বন্ধ না হবে ততদিন গণতন্ত্র মুক্তি পাবে না। বেশীরভাগ সময় রাজনীতিবিদরা ছাত্রদের ব্যবহার করে তাদের নিজেদের অপকর্ম ঢাকার জন্য। পৃথিবীর বেশীরভাগ দেশে ছাত্র-রাজনীতি নেই সে সব দেশে কি নেতা তৈরী হয় না? আমাদের দেশের সব নেতা-নেত্রীরা তাদের নিজেদের ছেলে-মেয়েদের বিদেশে পড়া-লেখা করায় আর এ দেশের ছাত্রদের তারা রাজনীতির ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করে। আমাদের নেতা সারা বিশ্বের নেতা রাসুল (সাঃ)-এর আদর্শ হলো তিনি নিজের জন্য যা পছন্দ করতেন সেটা তার অনুসারীদের জন্যও পছন্দ করতেন। আমাদের দেশের নেতারা নিজের জন্য যা পছন্দ করেন তার কর্মীদের জন্য তা পছন্দ করেন না। আমাদের নেতা একজনই যিনি দু'জাহানের বাদশাহ যিনি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল কাজের পথ-প্রদর্শক তিনি হলেন আমাদের রাসুল হযরত মুহম্মদ (সাঃ)।

কোনো কর্মকর্তা যদি সঠিক নিয়মে কেনাকাটা করতে চায় তাহলে তার ভাগ্যে একটি উপাধি জোটে আর সেটি হলো "ফকিন্নির বাচ্চা"। খলিফা হবার পর আবুবকর ছিদ্দিক মাথায় কাপড়ের গ্যাট নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে হযরত ওমর (রাঃ)-এর সাথে দেখা। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন আপনি যদি পূর্বের ন্যায় কাপড়ের ব্যবসা করেন তাহলে খেলাফত চালানো সম্ভব না। তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন তাহলে আমার সংসার চলবে কেমন করে? হযরত ওমর (রাঃ) বললেন রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে আপনার সংসার চালানোর মতো ভাতার ব্যবস্থা করা হবে। যে পরিমাণ টাকা হলে কোনো রকমে সংসার চালানো যাবে ঠিক সেই পরিমাণ টাকা তিনি ভাতা হিসেবে নিতেন। খলিফার স্ত্রী প্রতিবেলা রুটি বানানোর পূর্বে এক মুষ্টি আটা তুলে রাখতেন, এইভাবে ২-৩ কেজি আটা জমা হওয়ার পর সেটি বাজারে বিক্রয় করে মাংশ কিনেছিলেন। খলিফা খাবারের সময় জানতে চাইলেন মাংশ কীভাবে রান্না হলো? তার স্ত্রী জানালেন মুষ্টির আটা বিক্রয় করে মাংশ কিনা হয়েছে। বিষয়টি শুনে তিনি খুব ক্ষিপ্ত হলেন, তিনি বললেন তার খেলাফতে বেশীরভাগ মানুষ যেখানে মাংশ খেতে পায় না, সেখানে তিনি নিজে মাংশ খেলে তিনি আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবেন।

মসজিদকে শুধুমাত্র নামাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমস্ত সমস্যা সমাধানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে হবে

প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর পদাঙ্ক শতভাগ অনুসরণ করা মুসলমান হিসেবে আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আমাদের দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মুসলমান নবীর সুন্নত শতভাগ পালনের বিষয়ে আগ্রহী নয়। যারা শতভাগ নবীর সুন্নত মেনে চলার চেষ্টা করেন এবং অন্যকেও তা অনুসরণের জন্য তাগিদ দেন তাদেরকে আমরা মৌলবাদী বলে ট্যাগ লাগিয়ে হেয় করে থাকি। নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ, উদার ও অসাম্প্রদায়িক বলে প্রচার করে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলি। একজন প্রগতিশীল এবং বাস্তববাদী মানুষ হিসেবে আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারি ইসলামের চেয়ে প্রগতিশীল এবং আধুনিক ধর্ম পৃথিবীতে দুইটি নেই। ইসলাম হলো সবচেয়ে আধুনিক ধর্ম এবং প্রগতিশীল ধর্ম। ইসলামের চেয়ে আধুনিক ও প্রগতিশীল ধর্ম পৃথিবীতে আগে কখনো আসেনি এবং ভবিষ্যতেও কখনো

আসবে না। বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদের মধ্যে বিভেদ তৈরীর জন্য কিভাবে কাজ করছে তা অনুধাবন করা খুবই দুষ্কর। ইংরেজদের তৈরী আলিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে পর পর ২৬ জন প্রিন্সিপাল খ্রিষ্টান হওয়া এই সবই ষড়যন্ত্রের অংশ। বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক দলগুলোর অভিভাবকেরা ব্যক্তি স্বার্থে দলগুলোকে ব্যবহার করার কারণে মানুষের মধ্যে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কোনো ব্যক্তির ভুলের দায় দলের উপরে পড়ে, আবার দলের ভুলের কারণে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, আর দলের চেয়ে দেশ বড়। আমরা ব্যক্তিস্বার্থকে বড় করে দেখার কারণে দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আবার দল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মসজিদে নববীতে বসে রাসুল (সাঃ) যেভাবে খেলাফত পরিচালনা করতেন ঠিক একইভাবে যদি আমরা সমাজ পরিচালনা করতে না পারি, তাহলে কখনো এই সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আসবে না। কোনো কিছু চরম অবস্থায় পৌঁছার পর প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সেটি আবার সংশোধিত হয়। আমাদের সমাজব্যবস্থা তথা রাষ্ট্রব্যবস্থা যে খারাপ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে এর চেয়ে খারাপ হওয়ার আর জায়গা নেই। আজ আমরা মজলুম আর মজলুমদের দোয়া আল্লাহ্ সবার আগে কবুল করেন। নিশ্চই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের রহমত আর সহানুভূতি আমরা পাবো আর সেটিকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের স্বপ্নের পৃথিবী বির্নিমাণ করবো। বর্তমান পৃথিবীকে বলা হচ্ছে গ্লোবাল ভিলেজ। আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে আমাদের প্রিয় রাসূল গ্লোবাল ভিলেজের যে ধারণা দিয়েছিলেন আজকের বিশ্ব সেটি বাস্তবায়ন করছে। যে গ্লোবাল ভিলেজের ধারণাটা মুসলমানদের মাথা থেকে বের হওয়া উচিৎ ছিল, সেটি জ্ঞানচর্চার অভাবের কারণে অন্য ধর্মের মানুষের নিকট থেকে আমাদের শিখতে হচ্ছে। আমরা বিশ্ববাসীকে এমন একটি মডেল অর্থনীতি উপহার দিতে চাই যার সুদূরপ্রসারী সুফল সারা বিশ্ব ভোগ করবে।

পত্রিকায় দেখেছিলাম একজন গৃহকর্তা তার স্ত্রী আর দুই সন্তানকে হত্যা করে পরে নিজেও আত্মহত্যা করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি চিঠি লিখে গিয়েছেন, তাতে তিনি লিখেছেন ঋণের দায়ে মরে গেলাম। তিনি বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। এনজিও'র সুদের বোঝা টানতে গিয়ে তিনি তার পৈতৃক জমি বিক্রয় করেছেন, তারপরও তার নিষ্কৃতি মিলেনি। অবশেষে ৪টি তাজা প্রাণ ঝরে যাওয়ার পর তিনি

সুদখোরদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন। পৃথিবীতে কারও শত্রুরও যেন এই রকম পরিণতি বরণ করতে না হয়, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট সেই দোয়াই করি।

প্রিয় রাসুল (সাঃ) ছিলেন সফল রাষ্ট্রনায়ক, সমাজ সংস্কারক, সমর বিশারদ ও ন্যায় বিচারক। জীবনের প্রতিটি সমস্যা সমাধানে তার নির্দেশিত পথ যদি আমরা অনুসরণ করতে পারি তাহলে অনতিবিলম্বে মুসলমানেরা বিশ্ব নেতৃত্ব ফিরে পাবে।

ইমামদের কার্যক্রম শুধু নামাজ পড়ানো, জানাজা পড়ানো আর বিয়ে পড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। ইমামদেরকে হতে হবে আগামী দিনের নেতা। যে কোনো বিচার বা মিমাংসা কোরআন-সুন্নাহ্ রীতি-নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা হলো কিনা সে বিষয়ে ইমাম সাহেবের মতামত নিতে হবে। যে কোনো সমস্যার নিষ্পত্তি হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। ব্যবসা ও রাজনীতিও পরিচালিত হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। সুদী অর্থ-ব্যবস্থার কারণে দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া আমাদেরকে নিঃস্ব করে দিচ্ছে। ব্যবসার সবচেয়ে বড় মূলধন হচ্ছে সুনাম। যেটি ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না বা যার গুরুত্ব অর্থের মাপকাঠিতে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না, যার গুরুত্ব অপরিসীম। সামাজিক ব্যবসার সুনাম যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে তখন কেউ আর এর অগ্রযাত্রা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

ইসলামের বিধি-বিধান ৫০% মানবো আর ৫০% মানবো না এটাই ব্রিটিশ-আমেরিকানদের শিখানো ইসলাম। যার মাধ্যমে ব্রিটিশ-আমেরিকানরা সৌদি আরবে ১৯২২ সন হতে ওহাবী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে আসছে। তাদেরকে প্রথমে টোপ দেয়া হয়, আপনারা কেন ওসমানিয়া সম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন? তারা সারা বিশ্বে কলোনিয়াল শাসন ব্যবস্থা চালু রেখেছিল এতে দোষের কিছু হয়নি কিন্তু ওসমানিয়া সম্রাজ্য ভাঙার জন্য তাদের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল। আর ওসমানিয়া সম্রাজ্যের সুলতানেরা জোর করে সৌদি আরবকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেনি, বরং অটোমান সম্রাজ্যের সুলতানদের ন্যায়-পরায়ণতা ও বিচক্ষণতা দেখে সৌদি-আরব তাদের নেতৃত্ব মেনে নেয়।

আজকে আমরা ইসলামী বিধি-বিধান শতভাগ পালনের জন্য আহ্বান জানালে আমাদেরকে মৌলবাদী, ধর্মান্ধ ও এক্সট্রিমিস্ট বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে জঙ্গিবাদের ধোয়া তুলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ইসলামী

চিন্তাবিদ কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত ভুলকে পুজি করে সারা বিশ্বের সব মুসলমানকে দোষারোপ করা যাবে না। কোনো মৌলভী-মৌলানা যদি ভুল করে থাকে বা ইসলামকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করে থাকে তাহলে তাকে সংশোধনের দায়িত্ব আপনার উপরও বর্তায়। ইসলামকে যারা নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে তারাই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ব্যবসায়ী। আর কতিপয় ধর্ম ব্যবসায়ীর ভুলের জন্য আমরা ইসলামী জীবন-বিধান হতে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারি না। ইসলাম হলো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। এটিকে শতভাগ অনুসরণ করতে হবে, এতে কোনো দ্বিমত নেই। অর্ধেক মানবো আর অর্ধেক মানবো না তাহলে ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান সেটাকে অস্বীকার করা হয়।

তিনটি জিনিস মানুষকে ধ্বংস করে

মিথ্যা, হিংসা এবং অহংকার এই তিনটি জিনিস মানুষকে ধ্বংস করে। সকলের এই তিনটি বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিৎ। মিথ্যা হলো প্রতিটা পাপের সূতিকাগার। অর্থাৎ পাপ শুরু হয় মিথ্যার মাধ্যমে। মানুষ যদি মিথ্যা বলা বাদ দেয়, তাহলে তার পক্ষে আর কোনো পাপ করা সম্ভব নয়। ঘুষ আর দুর্নীতি আমাদের প্রধান সমস্যা। আমরা যদি মিথ্যা বর্জন করতে পারি তাহলে ঘুষ ও দুর্নীতি হতে সমাজ তথা দেশ কিছুটা হলেও মুক্তি পাবে। আগে হজ করার পর হাজী সাহেবরা ঘুষ খাওয়া হতে বিরত থাকতো। বর্তমানে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে যে হজ করে আসার পরও তারা ঘুষ খাওয়া থেকে বিরত হচ্ছে না। পৃথিবীতে প্রতিটি পাপ কাজ সংগঠিত হয় গোপনীয়ভাবে। অর্থাৎ পাপী নিজেও খুব ভালোভাবে জানে, যে কাজটা সে করছে, তা সে ঠিক করছে না, বিধায় কেউ যেন দেখতে না পায়, সে কারণে লোকচক্ষুর অন্তরালে সে তা করে থাকে। প্রতিটি মুসলমান এই কথা বিশ্বাস করে যে, পাপ যত গোপনে করা হোক না কেন মহান আল্লাহ্ তা দেখেন। শুধু আল্লাহকে ভয় করার মাধ্যমেই আমরা যেকোনো ধরনের পাপ হতে বিরত থাকতে পারি।

আপনারা জানেন চীনের বেশীরভাগ লোকেরাই কোনোপ্রকার ধর্ম-কর্ম করে না। রোজার মধ্যে একজন চীনের লোক ঢাকায় এসে দেখে এখানে সব লোক রোজা থাকে। রোজার বিষয়টি জানার পর সে প্রশ্ন করে, কোনো রোজাদার চুরি করে গোপনে কিছু খায় কিনা? তাকে জানানো

হলো গোপনে চুরি করেও কেউ কিছু খায় না। কারণ মুসলমানেরা বিশ্বাস করে তারা যত গোপনে যত কিছুই করুক না কেন, আল্লাহ্ সব দেখেন। তখন চীনা লোকটি বলেছিল, যে আল্লাহর প্রতি আপনাদের এত বিশ্বাস, তাহলে তো আপনাদের দ্বারা কোনোপ্রকার খারাপ কাজ করা সম্ভব না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সবকিছু দেখে সেটা যত সংগোপনে করা হোক না কেন, এই চেতনাকে আমরা যত বেশী ধারণ করতে পারব এবং লালন করতে পারব ততবেশী মিথ্যাকে প্রত্যাখান করা সম্ভব হবে। পাপ কাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সেটা সবাই গোপনে করে। পাশাপাশি সব পাপী লোকেরা সমাজে ভদ্রলোক হিসেবে বাঁচতে চায় এবং তার পাপের কথা কাউকে বলতে চায় না। পাপ এমন একটি অর্জন সেটি জানাজানি হয়ে গেলে মানি মানুষের মানহানি হয়। শুধুমাত্র রোজার মধ্যেই আমরা মনে রাখি আল্লাহ্ সব দেখেন, কিন্তু রোজা চলে যাবার পর আল্লাহ যে সব কিছু দেখে এই কথাটিই আমরা সবাই আগে ভুলে যাই।

মিথ্যা কথা বললে রিযিক ও বরকত নষ্ট হয়, আয়ু কমে যায়, মানুষের চেহারা মলিন হয়ে যায়। মিথ্যা বলার মাধ্যমে মানুষ যে সম্পদ অর্জন করে তা কখনো স্থায়ী হয় না। অপরদিকে রাসুল (সাঃ) ছোটবেলা হতেই সত্য কথা বলার কারণে আল-আমিন উপাধিতে ভূষিত হন। জীবন বাঁচানোর জন্যও তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। মিথ্যাবাদী লোককে সমাজে কেউ বিশ্বাস করে না, মিথ্যাবাদী লোক প্রতি পদে পদে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হন। সত্য কথা বলার কারণে যদি মৃত্যুও হয়, তাহলে সে মৃত্যু হবে শহীদি মৃত্যু। সত্য কথা বলার কারণে যদি কোনো লোকের মৃত্যুও হয় তাহলে জাতি তাকে যুগ যুগ ধরে শ্রদ্ধাভরে স্বরণ করবে। যেমনভাবে শ্রদ্ধাভরে স্বরণ করা হয়, লাহোরের কাঠমিস্ত্রী ইলমুদ্দীনকে। ইলমুদ্দীনের জানাজায় যত লোক হয়েছিল তখনকার দিনে ভারত উপমহাদেশের কোনো নেতার জানাজায়ও এত লোক হয়নি।

আমাদের গ্রামে একটি জনপ্রিয় প্রবাদ আছে। হিংসুকের ভাত নেই, আর পেন্দীর ঔষধ নেই। হিংসুটে মানুষের মন খুব ছোট হয়ে থাকে। তারা অন্যের ভালো সহ্য করতে পারে না। হিংসুটে মানুষ নিজের কাজে মন না দিয়ে, অন্যের কাজের প্রতি বেশী মনোযোগী হয়, যার ফলে তাদের পরিণতি খুব ভালো হয় না। তারা নিজের কাজে মন না দিয়ে অন্যের ক্ষতি করতে বেশী সময় ব্যয় করে থাকে। প্রতিটি মানুষকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিৎ, আমরা কারও উপকার করতে না পারি অন্তত

ক্ষতি যেন না করি। কারও ক্ষতি করে কেউ কখনো সফল হতে পারে না, পলাশী যুদ্ধের বিশ্বাসঘাতকদের যে পরিণতি বিশ্ববাসী দেখেছে তা থেকে শিক্ষা নেয়া প্রয়োজন। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো কেউ ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। অন্যভাবে বলা যায় যে, ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবীতে কোনো কিছু স্থায়ী না বা আমাদের যে মরতে হবে এ কথাটি সবার আগে আমরা ভুলে যাই। মৃত্যুর কথা মনে থাকলে কেউ কারও হক নষ্ট করতে পারত না। যুক্তি ছাড়া যারা তর্ক করে তাদেরকে পেন্দী বলা হয়।

যাদের মধ্যে হিংসা নেই তারা কম পরিশ্রমে গ্রুপ স্টাডি করে অনেক ভালো ফল বয়ে নিয়ে আসতে পারে। কয়েকজন বন্ধু মিলে ব্যবসা করে খুব তাড়াতাড়ি ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। দশ জনের ভাগ্য যেখানে মিলিত হয় সেখানে আল্লাহর বরকত থাকে। আমরা তখনই খাঁটি ঈমানদার হতে পারবো যখন আমরা অন্যের সুখে সুখী এবং একইভাবে অন্যের দুঃখে দুঃখী হতে পারব।

অহংকার হলো মহান আল্লাহ্ রাব্বুর আলামীনের ভূষণ। সুতরাং অহংকার করা শুধুমাত্র আল্লাহরই মানায়। মাটির তৈরী কোনো মানুষ যদি অহংকার করে তাহলে আল্লাহ সেটা সহ্য করেন না। অহংকারী মানুষ আর হক নষ্টকারী মানুষদের বিচার আল্লাহ দ্রুত করে থাকেন। এই অহংকারী মানুষরা জুলুমবাজ হয়, আর মজলুমদের দোয়া আল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি কবুল করে থাকেন। কেন মানুষ হঠাৎ করে অহংকারী হয়ে উঠে? মানুষের জীবনে প্রত্যাশার চেয়ে প্রাপ্তি বেশী ঘটলে মানুষ অহংকারী হয়ে উঠে। আপনারা সবাই নিশ্চয় সাজ্জাদের নাম শুনেছেন। যার মায়ের জীবন কবজ করতে গিয়ে আজরাইল নিজে কেঁদেছিলেন এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছিলেন সাজ্জাদের মায়ের জীবন কবজ না করার জন্য। ধনী মানুষরা তাদের ধনের অহংকার করে, মেধাবীরা তাদের মেধার অহংকার করে, নেতারা ক্ষমতার অহংকার করে, আর স্মার্ট-সুন্দরী যুবক-যুবতীরা তাদের রূপের অহংকার করে। আবার অনেকে বলেই ফেলে অহংকার করার মতো কোনো কিছু থাকলে মানুষ অহংকার করবে এটাই স্বাভাবিক। দু'জাহানের বাদশা প্রিয় নবী যেহেতু কোনোদিন অহংকার করেন নাই সুতরাং আমাদের সেটা করা উচিৎ না। অহংকারীদের পতন অনিবার্য, যদি আমাদের কথায়, কাজে ও আচরণে অহংকারের প্রকাশ ঘটে তাহলে প্রথমেই যে ব্যক্তির সাথে সেটি সংঘটিত হয়েছে তার নিকট ক্ষমা চাওয়া

উচিৎ। তারপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া উচিৎ। ক্ষমা একটি মহৎ গুণ, কেউ ক্ষমা চাইলে বা কাউকে ক্ষমা করে দিলে মানুষ কখনো ছোট হয় না বরং তার উদারতা এবং মহত্ত বৃদ্ধি পায়। এই সব কার্যাবলীর মাধ্যমে মানুষের নিকট মানুষের সম্মান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আসুন আমরা সবাই আপন মনে সবাইকে ক্ষমা করে দিই। কেননা মৃত্যুর পরে আর ক্ষমা চওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না, আর কার কখন ডাক পড়বে এটা আমরা কেউ বলতে পারি না।

স্বাধীনতার পঞ্চান্ন বছর পরেও কেন বাংলাদেশে গণতন্ত্র মুক্তি পায়নি

যে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতকে প্রাধান্য দেয়ার নামই হলো গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের জনক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেটাকে সর্বকালের সেরা সংজ্ঞা হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের দেয়া সংজ্ঞাটি হলো, 'Of the people, By the people, For the people.' সংজ্ঞাটির বাংলা অর্থ হলো, জনগণের দ্বারা, জনগণকে দিয়ে এবং জনগণের জন্য। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে যে গণতন্ত্র বিরাজ করছে তাকে এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, 'Off the people, Buy the people, Far the people.' জনগণের টুটি/গলা (মাথা ও দেহের মধ্যবর্তী অংশ) চেপে ধর, যেমন করে ধরত আগের দিনের জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীরা, ভোটের সময় আসলে জনগণকে টাকা দিয়ে কিনে ফেলে দাও, ভোটের পরে জনগণ থেকে দূরে থাকে।

সবর্কালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রকামী ও মানবতাবাদী মহামানব ছিলেন আমাদের প্রিয় রাসুল (সাঃ)। আমরা তার পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, আমরা গণতন্ত্র ও মানবতা শিখতে যাই পশ্চিমা বিশ্বের কাছে। যারা টাকা দিয়ে লোক ভাড়া করে বোমাবাজি করে মুসলমানদের সন্ত্রাসী-জঙ্গি বানায়। এ কথা কোন মুসলমানের ভুলে যাবার কথা না যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 'যে একজন মানুষকে হত্যা করলো সে যেন সমস্ত মানব জাতিকেই হত্যা করলো।' মানবতাবাদী সেই নবীর উম্মতরা কখনও বোমাবাজি করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের শত্রুরা টাকার বিনিময়ে বোমাবাজি করে মুসলমানদের সন্ত্রাসী-জঙ্গিবাদ তকমা দেয়।

রাসুল (সাঃ)-এর এর মৃত্যুর সময় তাকে অনুরোধ করা হয়েছিল, আপনার মৃত্যুর পরে খেলাফত প্রধান কে হবে সেটা ঘোষণা করার জন্য। গণতন্ত্রের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলেই তার পক্ষে সবার অনুরোধকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়, খেলাফতপ্রধান কে হবেন সেটা ফয়সালা হতে দেরী হওয়ার কারণে তার মৃত্যুর পর দাফনকার্য সম্পাদন করতে দুই দিন বিলম্ব হয়েছিল। রাসুল (সাঃ) মৃত্যুর সময় যদি বলে যেতেন পরবর্তী খেলাফত প্রধান কে হবেন, তাহলে সেটি একটি রেওয়াজে পরিণত হতো এবং বিষয়টি রাজতন্ত্রকে উৎসাহিত করতো। তিনি মনেপ্রাণেই একজন গণতন্ত্রকামী মহামানব ছিলেন বলেই রাজতন্ত্রের বিপক্ষে মুমূর্ষু অবস্থায়ও অটল ছিলেন। রাসুল (সাঃ) এর উপর্যুক্ত উক্তি এবং উপর্যুক্ত ঘটনার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে, তাঁর মতো এত বড় মানবতাবাদী ও গণতন্ত্রকামী মহামানব পৃথিবীতে অতীতে কোনোদিন আসে নাই এবং ভবিষ্যতেও কোনোদিন আসবে না।

আমি শৈশব থেকেই একজন সমাজতান্ত্রিক মানসিকতার মানুষ এবং এখনো আমি আমার নীতিতে অবিচল রয়েছি এবং ভবিষ্যতেও অবিচল থাকব আল্লাহ যদি সহায় থাকেন। ছাত্রজীবনে কার্ল মার্কস এর অর্থনীতিকে সমাজ পরিবর্তনের নিয়ামক মনে করতাম। কিন্তু Finance-এর (অর্থ-সংস্থানের) ছাত্র হিসেবে এটা আমি বর্তমানে জোর দিয়ে বলতে পারি মানুষের তৈরী কোনো মতবাদ বা কোনো অর্থ-ব্যবস্থা কোনোদিন মুক্তির পথ হতে পারে না। প্রিয় রাসুল (সাঃ) সোনার মদিনায় যে সমাজব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন তার চেয়ে সফল সমাজব্যবস্থা পৃথিবীতে আগে কখনো আসেনি এবং ভবিষ্যতেও কখনো আসবে না। সুতরাং এ কথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, রাসুল (সাঃ) প্রবর্তিত সমাজব্যবস্থায় সর্বকালের সেরা সমাজব্যবস্থা বা সমাজতন্ত্র। মেধা আর যোগ্যতার ভিত্তিতে কোনো কিছু হয় না বলেই, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় শ্রেণির লোকেরা আর দেশে কাজ করতে চায় না, তারা বিদেশে কাজ করে স্বাচ্ছন্দবোধ করে। একই কারণে ভালো লোকেরা আর রাজনীতি করতে চায় না। বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হলো মূর্খরা মঞ্চে বসে আর জ্ঞানী লোকেরা পালিয়ে বেড়ায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে ১৯৯১ সনের ঢাকার মিরপুরের নির্বাচন, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছিলেন নৌকা প্রতীক নিয়ে ড. কামাল হোসেন আর ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে এসএ খালেক। নির্বাচনে সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল

হোসেন ফেল করেছিলেন আর এসএ খালেক পাশ করেছিলেন এই অবস্থা আর চলতে দেয়া যায় না।

আল্লাহ বলেছেন তোমরা যেরকম আমি তোমাদের তেমনি শাসক দিয়ে থাকি। গণতন্ত্রের জনক আমেরিকা প্রদত্ত বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত যে গণতন্ত্র তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল হযরত ওমরের সময়ের ইসলামী শাসনব্যবস্থা। আর ইসলামী খেলাফতের সেই শাসনব্যবস্থা আমরা যদি ফিরিয়ে আনতে পারি তাহলে শুরু হবে ইসলামের স্বর্ণযুগ। যে শাসনব্যবস্থায় কেউ নেতা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে সে আর কোনোদিন নেতা হতে পারবে না। চাকুরির বিজ্ঞপ্তিতে এক সময় লেখা থাকতো প্রার্থী কোনোপ্রকার যোগাযোগের চেষ্টা করলে সেটা তার অযোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে। ইনসাফী শাসনব্যবস্থায় নেতা হওয়াটা কোনো লাভজনক বিষয় না বরং এটা গুরুদায়িত্ব। বাংলাদেশের দুই রাজ-পরিবারের স্বার্থের বিরুদ্ধে যদি তাদের দলের কোনো নেতা কোনো সত্য কথাও বলে, তাহলে নেতার নাম থেকে তার নাম খারিজ হয়ে যাবে। আর এই কারণেই ঐ দুই দলের মাধ্যমে গণতন্ত্র কোনোদিন মুক্তি পাবে না। পশ্চিমা বিশ্বের প্রচলিত বর্তমান গণতন্ত্রে রাজার ছেলের রাজা হওয়ার সুযোগ নেই, একজন রিকশাওয়ালার ছেলেরও যদি যোগ্যতা থাকে তাহলে সে দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুযোগ আছে। আমাদের দেশে গণতন্ত্র নেই বিধায় একজন রিকশাওয়ালার ছেলের যত যোগ্যতাই থাক না কেন তার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বাংলাদেশের বড় দুটি রাজনৈতিক দল কোনোদিন চাইবে না এ দেশে গণতন্ত্র মুক্তি পাক। আমরা যতদিন এই দুই রাজ পরিবারের নাগালের বাইরে যেতে না পারব ততদিন মেধা আর যোগ্যতার মূল্যায়ন হবে না। মেধা আর যোগ্যতার ভিত্তিতে যতদিন দেশ পরিচালিত না হবে ততদিন গণতন্ত্র মুক্তি পাবে না। কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, যতদিন গণতন্ত্র মুক্তি না পাবে ততদিন মেধা আর যোগ্যতার মূল্যায়ন হবে না। অথচ খেলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় হযরত ওমরের মতো এত রাগী নেতার সামনেও সত্য কথা বলতে কেউ ভয় পেত না। ১৯৭০ সনের আগে এ দেশের জনগণ জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে পারতো না। যে দেশের জনগণ হাজার টাকার বিনিময়ে নিজের ভোট বিক্রয় করে, সে দেশের জনগণের ভোটের অধিকার থাকা না থাকা সমান কথা। ব্রিটিশ সময়কালে সংসদ নির্বাচনে গ্রাম প্রতি ২-১ জন করে সমাজপতিরা ভোট দিতে পারতো। আমাদের দেশের সব বড়

দলই ভোটের আগে বিদেশী প্রভুদের নিকট ধরণা দেয়া শুরু করে, যেটি একটি স্বাধীন ও সাবোভৌম দেশের জন্য খুবই লজ্জাজনক। দেশের মানুষের প্রতি আস্থা নেই বলেই তারা বিদেশী প্রভুদের কাছে ধরণা দেয়। আর যারা বিদেশী প্রভুদের সমর্থন নিয়ে নির্বাচনের মাঠে নামে তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা উচিৎ। বাংলাদেশের বড় দুটি রাজনৈতিক দল, যারা এই দেশের ৭০% লোকের প্রতিনিধিত্ব করে তারা নিজেদের দলে গণতন্ত্রের চর্চা করে না। সেখানে মেধা আর যোগ্যতার ভিত্তিতে নেতৃত্ব নির্ধারিত হয় না। তারা নেতা তৈরী না করে বিশ্বস্ত চাকর তৈরী করে। আর ভোটের সময় টাকার বিনিময়ে নোমিনেশন বিক্রয় করে থাকে। যেমনটি ইংরেজরা জমিদারের মাধ্যমে তাদের জমিদারী প্রথা বজায় রেখেছিল। ইংরেজদের দেখানো পথে এখনো আমরা পথ চলছি। জমিদারেরা যেমন নজরানার বিনিময়ে ইংরেজদের নিকট হতে জমিদারি ক্রয় করতো, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের দেশের নেতারা নোমিনেশন কিনে থাকে। জমিদারেরা যেমন সাধারণ মানুষের নিকট হতে খাজনা আদায় করতো, বতর্মানে নেতারা একইভাবে চাঁদা ও ঘুষ আদায় করে থাকে। সেখানে চাকরি পাওয়ার মানদণ্ড হলো টাকা, এখানে মেধা আর যোগ্যতার কোনো দাম নেই। বাংলাদেশের বৃহৎ দুটি রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের টুটি চেপে ধরেছে। অন্য দলের লোকেরা মেধাবী হলেও রাজনীতির ট্যাগ লাগিয়ে তাদেরকে চাকরিতে প্রবেশ করতে দেয় না, আবার কখনো চাকরি হতে স্বেচ্ছায় অবসরে পাঠান। এই অবস্থা চলতে থাকলে দেশ একদিন গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাবে। এটা দেশের জন্য কোনোদিন কল্যাণ বয়ে আনবে না। এই ধরনের অন্যায় মধ্যযুগয়ী বর্বরতাকে হার মানায়। বাংলাদেশের বৃহৎ তিনটি দলকে যদি এই দেশের ইতিহাস লিখতে দেয়া হয়, তাহলে গ্রহণযোগ্য ইতিহাস কেউ লিখতে পারবে না। যে দল ক্ষমতায় আসে সে তার মতো করে ইতিহাস রচনা করে। এতে করে বিপাকে পড়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। পৃথিবীতে এমন জাতি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে কিনা ক্ষমতা পরিবর্তনের সাথে সাথে দেশের ইতিহাস পরিবর্তন করে ফেলে।

সব বন্য প্রাণীরা বনে বাস করে কিন্তু কুকুর-বিড়াল বনে বাস করতে পারে না কেন?

হরিণ, মহিষ ও বনমোরগ ইত্যাদি নিরীহ প্রাণী বনে বাস করতে পারলেও কুকুর ও বিড়াল বনে বাস করতে পারে না। এক কুকুর অন্য কুকুরকে কামড় দেয় অনুরূপভাবে এক বিড়াল অন্য বিড়ালকে আক্রমণ করে যার ফলে তারা বনে বাস করতে পারে না। তাদের নিজেদের মধ্যে কোনোপ্রকার একতা নেই। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলোর মধ্যে কোনো ঐক্য না থাকার কারণে শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানদের দেশে আমাদের সমর্থকের পরিমাণ শতকরা বিশ ভাগের বেশী হবে না। প্রকাশ্য জনসভায় একটি ইসলামী দল আর একটি ইসলামী দলকে আক্রমণ করে কথা বলে। স্বার্থে আঘাত লাগলে একটি ধর্মভিত্তিক দল অন্য একটি ধর্মভিত্তিক দলকে প্রকাশ্য জনসভায় গীবত করতে দ্বিধাবোধ করে না, এমনকি তারা একে অন্যকে কাফের বলতেও পিছপা হয় না। আপনারা যতবেশী নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি করবেন অন্য দলের লোকেরা তত বেশী মজা পাবে। এক পীরের মুরিদের সাথে অন্য পীরের মুরিদের মারামারি এমনকি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এক সময় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল।

মুসলীম লীগের জন্ম হয়েছে ১৯০৬ সনে ঢাকার আহসান মঞ্জিলে, তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য একটি স্বাধীন দেশ করা। তারা মুসলমানদের জন্য স্বাধীন পাকিস্তান করতে সক্ষম হলেও প্রিয় রাসুলের নীতি ও আদর্শ থেকে যোজন যোজন মাইল দূরে অবস্থান করার কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তারা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর জন্ম হয়েছে ১৯৪১ সনে পাকিস্তানের তাত্ত্বিক নেতা আবুল আলা মৌদুদীর হাত ধরে। জামায়াতে ইসলামের জন্মের ৬ বছর পর পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছে। ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট মুসলমানদের জন্য স্বাধীন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তখন মুসলমানদের নেতৃত্বদানের জন্য শুধুমাত্র দুইটি ইসলামী দল ছিল, মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলাম। স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম লীগের অবদান অপরিসীম। পক্ষান্তরে, স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জামায়াতে ইসলাম বিরোধিতা করে। দুইটি মাত্র ইসলামী দল তাও আবার স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একমত পোষণ করতে পারেনি, কাজেই আমাদের সমর্থক যে ২০% আছে এটা মহান আল্লার অশেষ রহমত ছাড়া আর কিছু না। মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে যা বতর্মানে বাংলাদেশ আর জামায়াতে ইসলামের জন্ম হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে যা বর্তমানে পাকিস্তান হিসেবে পরিচিত। ইসলামী দলই ছিল মাত্র দুটি তার মধ্যে একটি দল স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেছে আর একটি দল স্বাধীনতার বিপক্ষে কাজ করেছে। মুসলিম লীগ ক্ষমতা পেয়েও ধরে রাখতে পারেনি রাসুলের আদর্শ থেকে দূরে থাকার কারণে। আর জামায়াতে ইসলাম এখন পর্যন্ত ক্ষমতার স্বাদ পায়নি তাদের নেতাদের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে। মুসলীম দলগুলোর মধ্যে একটি মোর্চা গঠন করতে হবে। একটি মুসলিম দল আর একটি মুসলিম দলকে প্রকাশ্য জনসভায় যেন গালি না দেয় বা গীবত না করে সে বিষয়ে সবাইকে একমত হতে হবে। সকল মুসলীম দলগুলোই চায় আল্লাহর আইন আর সৎ লোকের শাসন। যারা ইসলামী দল করে তারা আবার তাবলীগ জামায়াতকে গালি দেয় যেটা উচিৎ না। যারা ইসলামী দল করে তাদের অনেকের মধ্যে গাজী হওয়ার খায়েস আছে। পক্ষান্তরে যারা তাবলীগ করে তারা সেটি নিঃস্বার্থভাবেই করে থাকে। সুতরাং তাবলীগের কাজকেও নিরুৎসাহিত করা যাবে না। ইসলামী সব দল মিলে আমাদের জনসমর্থন আছে মাত্র বিশ ভাগ। এই হারকে কীভাবে ৫০%-এ উন্নীত করা যায় সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেটিই আমাদের একমাত্র পাথেয়।

আমরা যারা ইসলামী দল করি তারা অবশ্যই সেটি নিঃস্বার্থভাবে করতে হবে এবং শুধুমাত্র মহান রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তা করতে হবে। দুনিয়াবী কোনো স্বার্থের জন্য আমরা যদি কোনো ইসলামী দল করে থাকি তাহলে সেটি কোনোদিন আলোর মুখ দেখবে না, আর দেখলেও মুসলীম লীগের মতো অবস্থা হবে। আমরা প্রতিটা কাজ করবো মানুষকে ভালোবেসে, মানুষের কল্যাণে এবং মহান রবের সন্তুষ্টি লাভের আশায়। আর সেটি যদি আমরা করতে পারি তাহলে সফলতা আসবে ১০ বছরের মধ্যেই। প্রিয় রাসুল হিযরতের ৮ বছর পরেই মক্কা বিজয় করেছিলেন। আমাদের কাজের মধ্যে বা আমাদের নিয়তের মধ্যে অবশ্যই কোথাও কোনো ভুল আছে যার ফলে গত পঞ্চান্ন বছরে আমরা সফলতার

মুখ দেখি নাই। "ইন্নামাল আমালো বিন্নিয়াত" অর্থাৎ কর্মের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। ইসলামী দলগুলোর ক্রিয়াকলাপ প্রিয় রাসুলের নীতি ও আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ হচ্ছে না বিধায় সফলতা আসছে না। যে কোনো নিরীহ প্রাণী একতাবদ্ধভাবে চলে বলেই তারা নিরীহ হওয়া সত্ত্বেও বনে বাস করতে পারে। পক্ষান্তরে কুকুর আর বিড়াল নিজেদের জাত ভাইয়ের সাথে কামড়া-কামড়ি করে বলেই তারা বনে বাস করতে পারে না। সুতরাং কুকুর আর বিড়ালের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা নিজেদের মধ্যে হানাহানি বন্ধ করি এবং দূরত্ব কমিয়ে নিয়ে আসি।

আমরা যারা মহান আল্লার আইন আর সৎ লোকের শাসন কায়েম করতে চাই তাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতেই পারে তাই বলে প্রকাশ্য জনসভায় কেউ কারো সমালোচনা করা উচিৎ না। যারা ইসলামী দলের ধারক-বাহক তাদের কথা বলতে হবে অনেক হিসাব-নিকাশ করে। অন্য দলের লোকেরা যা খুশী তা বলতে পারে এতে লোকে কিছু মনে করবে না কিন্তু ইসলামী দলের নেতারা যদি সামান্য পরিমাণও ভুল করে সেটির সমালোচনা হবে বেশী। আস্তে আস্তে বরফ গলতে শুরু করেছে, যার ফলে মতবিরোধও কমে আসছে। ইসলামী দলগুলোর মধ্যে প্রতি মাসে একটি করে সমন্বয়-সভা হওয়া উচিৎ। বাংলাদেশে ইসলামী ভাবধারা বা চিন্তাভাবনা কীভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে সে বিষয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।

ইসলাম অতীব উত্তম পন্থা হওয়া সত্ত্বেও পূর্বের নেতাদের ভুলের কারণে বা কেউ এটা ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করার কারণে আমরা সফলতার মুখ দেখি নাই। কি কারণে আমরা সফল হতে পারছি না বা কীভাবে এটার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো যায় তা নিয়ে সবাইকে চিন্তাভাবনা করতে হবে। নীতি-আদর্শহীন দল জনগণের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করছে যেন তাদের চেয়ে বেশী জনদরদী আর কেউ নাই। একজন মানুষের মৃত্যুর পরে তার নীতি আর আদর্শ যে পৃথিবীতে থাকে না সেই প্রকৃত সত্যটা আমরা জনগণকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি। বিদেশী প্রভুরা আমাদের শিখিয়েছেন আমরা যেন ইসলামের অর্ধেক মানি আর অর্ধেক না মানি। আমরা যারা শতভাগ ইসলাম মানার জন্য কথা বলি তাদেরকে মৌলবাদী, কট্টরপন্থী, সেকেলে, খ্যাত বা আধুনিকতা বিরোধী বলে অবজ্ঞা করে থাকি। একজন প্রগতিশীল এবং বাস্তববাদী

মানুষ হিসেবে ঐ সব আধুনিকতার লেবাসধারী লোকদের আমরা জানিয়ে দিতে চাই, ইসলামের চেয়ে বেশী আধুনিক আর বেশী প্রগতিশীল ধর্ম পৃথিবীতে ইতঃপূর্বে কোনোদিন আসেনি এবং ভবিষ্যতেও কোন দিন আসবে না। এক ইসলামী দল যদি আর একটি ইসলামী দলকে আক্রমণ করে কথা বলি তাহলে আমরা কোনোদিনও সফলতার মুখ দেখব না। আমাদের অবস্থা হবে ঐসব কুকুর-বিড়ালের মতো।

মানুষের ক্ষতি হয় এমন কাজ কখনো করা যাবে না, প্রতিটি কাজ হবে মানুষকে ভালোবেসে, মানুষের কল্যাণে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষকে ভালোবেসে মানুষের কল্যাণে আমরা যদি কাজ করতে পারি তাহলে অনতিবিলম্বে আমরা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছতে পারব। এই স্লোগানকে ধারণ করে ও লালন করে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব ইনশাআল্লাহ। আমাদের ভালোবাসাটি যেন হয় অকৃত্রিম। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমি ও আমার জ্যাঠাতো ভাই আক্কাছ আলী প্রামাণিক রাজশাহী হাই মাদ্রাসা মাঠের পুকুরে গোছল করতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম একটি ছাত্র অন্য ছাত্রদের প্রতি খুব আন্তরিকতা-ভালোবাসা দেখাচ্ছিল। বিষয়টি আমি টের পেয়ে আক্কাছকে লক্ষ্য করতে বললাম। এই ছাত্রটির আন্তরিকতা-ভালোবাসা ছিল কৃত্রিমতায় ভরা। ছেলেটি ছিল কোনো একটি ছাত্র সংগঠনের নেতা, যাকে আক্কাছ চিনতো। আপনাদের প্রতি আমার আকুল আবেদন যদি আপনাদের মনে ভালোবাসা না থাকে তাহলে আপনারা ভালোবাসবেন না, কিন্তু ভালোবাসার অভিনয় কখনো করবেন না। আমরা যেন সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলতে শিখি। মিথ্যা যেমন প্রতিটা পাপের সুতিকাগার তেমনিভাবে সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলতে শিখাটা সত্য বলার প্রবেশদ্বার। কারও ক্ষতি করে কেউ কখনো সফল হতে পারে না, বরং প্রতিটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় তার চেয়ে কয়েকগুন বেশী। ধরে নিলাম আপনাকে আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো না কিন্তু আপনার ছেলেকে বা নাতিকে হলেও তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কেননা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ছাড় দেন কিন্তু কখনো ছেড়ে দেয় না। ন্যায়বিচার করতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কখনো

কাপর্ণ্য করেন না। রাসুল (সাঃ) এরশাদ করেছেন শেষ বিচারের দিন কিছু লোক পাহাড়-পর্বত পরিমাণ নেকী নিয়ে উপস্থিত হয়েও সফলকাম হতে পারবেন না। তারা হলো বান্দার হক নষ্টকারী এবং মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহারকারী। সেদিন লেনদেনের মাধ্যম হবে নেকী আর গুনাহ। অন্যের হক নষ্ট করা এবং মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করার কারণে সমস্ত নেকী যখন শেষ হয়ে যাবে তখন দেয়ার মতো কোনো নেকী আর অবশিষ্ট থাকবে না। তখন যার সাথে সে খারাপ ব্যবহার করেছে বা যার হক নষ্ট করেছে তার গুণাহ তাকে ধরিয়ে দেয়া হবে যেটা সে অর্জন করেনি। দুই পক্ষ যখন বিবাদে লিপ্ত হয় তখন তা মীমাংসা করে দেয়া ফরয কাজের মতোই উত্তম। যারা মানুষকে ভালোবেসে মানুষের কল্যাণে কাজ করে তাদের নেক মুকসুদ আল্লাহ কখনো অপূর্ণ রাখেন না। সুতরাং আমরা সবসময় চেষ্টা করবো মানুষের কল্যাণে কাজ করার। আপনি যে লোকের উপকার করলেন সে আপনার উপকারে আসবে না কখনো কিন্তু আপনার বিপদের সময় এমন লোক আপনার উপকারে আসবে যাকে আপনি কখনো দেখেননি বা চিনেন না। তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ যারা মানুষের কল্যাণে কাজ করে। ইউরোপ-আমেরিকার মানুষরা মনে করে আমরা যা আয় করলাম তা যদি সম্পূর্ণটা খরচ করে ফেলি তাহলে সেটা কোনো মানুষের কাজ হলো না। তাই তারা তাদের আয়ের কিছু অংশ চ্যারিটিতে দান করে। আর আমাদের দেশের এনজিওগুলো সেই টাকা নিয়ে এসে নিজে খায় আর যৎ সামান্য গরীব মানুষের মধ্যে বিলি করে ও ছবি তুলে বিদেশে পাঠায়। তারা যে গরীবদের মধ্যে চড়া হার সুদে ঋণ দিয়ে ব্যবসা করে এ সত্যটি তারা সবসময় গোপন রাখে। দারিদ্রকে হিমঘরে পাঠানোর নীল নকশা প্রেরণ করে আরও বেশী টাকা পাওয়ার জন্য ফন্দীফিকির করে।

সুতরাং আসুন আমরা সবাই মিলে একসাথ স্লোগান দেই, 'প্রতিটি কাজ হবে মানুষকে ভালোবেসে, মানুষের কল্যাণে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য।'